পিশাচ কাহিনী

আতঙ্কের প্রহর

অনীশ দাস অপু





পিশাচ কাহিনী

আতঙ্কের প্রহর

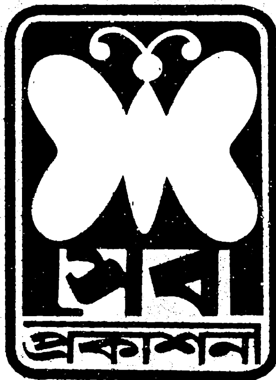
অনীশ দাস অপু



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-0221-0
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ATONKER PROHAR
Horror Stories
By: Anish Das Apu



তেতাল্লিশ টাকা

হুমায়ূন আহমেদ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার 'ছায়াসঙ্গী', 'কুটু মিয়া' এবং টিভি সিরিজ 'অদেখা ভূবন' আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আর আমার এ বইয়ের গল্পগুলোর ভয়াল আবহ আপনাকে দারুণভাবে চমকে দেবে [অবশ্য আপনি যদি সময় করে বইটি পড়েন তবেই]।

আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

সূচি

আতঙ্কের প্রহর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

আতঙ্কের প্রহর

গাড়িটা ঘুরে চলে যাচ্ছে, হাত নেড়ে বিদায় জানাল জেন। জঙ্গুলে পথ ধরে গাছপালার আড়ালে যান্ত্রিক কাঠামোটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতা গ্রাস করল জেনকে। নিজেকে খুব একা আর অসহায় মনে হলো। ঘুরে দাঁড়াল ও বাড়িটার দিকে।

লেকের পাড়ে এই ফ্যামিলি কটেজের দরজা এখনও বন্ধ। জেনের আমন্ত্রিত বন্ধুরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। অবশ্য জর্জ হলওয়ের আরও আগে পৌঁছার কথা। জিনিসপত্র গোছগাছ করে বাড়িটাকে একটা ভদ্রসভ্য রূপ দেবে বলে কথা দিয়েছিল জর্জ। কিন্তু ওর এখনও পাত্তাই নেই। আমি কি খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি? ভাবল জেন। ওকে এখন বাড়িতে ঢুকতে হবে। দরজা-জানালা খুলে সব কিছু রেডি করতে হবে। কিন্তু জেন গেটের সামনে দাঁড়িয়েই থাকল। কান পেতে শুনল ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া গাড়িটার এঞ্জিনের ক্ষীণতর শব্দ।

চারদিকে তাকাল জেন। লেকের আশপাশে কাউকে চোখে পড়ল না। পরিবেশটা কেমন ভূতুড়ে ঠেকল ওর কাছে। গা শিরশির করে উঠল। অথচ ভয় পাওয়ার মত কোন কারণ ঘটেনি। কি আশ্চর্য নিস্তব্ধ চারদিক! সূর্যের ঝকঝকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে গাছের সবুজ পাতায়। বাতাস উষ্ণ, আরামদায়ক। তারপরও কেন জানি ভয় ভয় করছে জেনের। শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত উঠছে। মনে হচ্ছে ওখানটায় কি যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

জেন হঠাৎ আবিষ্কার করল গাড়ির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। তার মানে ও যদি এখন কোন কারণে চিৎকার করে ওঠে, কেউ তা শুনতে পাবে না। হঠাৎ শব্দটা কানে এল জেনের। ওর সামনে, জঙ্গুলে রাস্তাটার ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে মরমর করে একটা শব্দ আসছে। শ্বাস বন্ধ করে ফেলল জেন।

এক মুহূর্ত পর শব্দটা থেমে গেল। হঠাৎ পোকামাকড়গুলো কোরাস্ গাইতে শুরু করল। তীক্ষ্ণ শব্দটা বিস্ফোরণের মত আঘাত করল জেনের কানে। ভয় পাওয়ার জন্যে নিজেকে মৃদু তিরস্কার করল ও। কাঠবেড়ালী বা ওই জাতীয় কোন প্রাণী ঝোপের আড়ালে দৌড়াতে গিয়ে ওরকম শব্দ করেছে, ভাবল সে।

ঝুঁকল জেন, ব্যাগটা তুলে নিল হাতে। এগোল কটেজের দরজার দিকে। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল। তীব্র ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। পুরানো, বাসী একটা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। ভেতরে ঢুকল জেন। ঘুরে দরজা বন্ধ করল।

রান্নাঘরে চলে এল জেন। একটা বাটিতে নির্জীব হয়ে যাওয়া কতগুলো বুনো

ফুল চোখে পড়ল। গত উইক এন্ডে যারা এসেছিল তারা হয়তো ফুলগুলো ফেলে দিতে ভুলে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল সে। জামাকাপড় ছাড়বে। বাসী গন্ধটা নাকে বড্ড লাগছে। সামনের বেডরুমের জানালাগুলো খুলে দিল জেন। খোলা হাওয়া আসুক। দ্রুত হাতে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে জর্জ হলওয়ের কথা ভাবল ও। এখনও আসছে না কেন সে?

গত রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বাসার চাকরানীটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে জেন যখন নিজের বাসায় ফিরছে, এই সময় ট্রাফিক লাইটের কাছে জর্জের সঙ্গে ওর দেখা হয়ে যায়। জর্জ ওর গাড়ির দিকে হেঁটে আসছিল। সঙ্গে একটা মেয়ে। দু'জনেই বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। মেয়েটার সঙ্গে জর্জ ক্রুদ্ধস্বরে কথা কাটাকাটি করছে আর মেয়েটা অঝোরে কাঁদছে।

জেন জানালার কাঁচ নামিয়ে জর্জকে ডাকল লিফট দেয়ার জন্যে। জর্জ জেনকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল, মাথা নেড়ে বলল তার লিফটের দরকার নেই, খুব বেশি দূরে যাবে না তারা। মেয়েটাকে এক পলক দেখতে পেল জেন। মাথায় সোনালি চুল, মুখখানা মলিন। এই সময় সিগন্যালে সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। বাধ্য হয়ে আগে বাড়তে হলো জেনকে।

শহর থেকে দূরে, অখ্যাত এই জায়গায় জর্জ হলওয়ের সঙ্গে সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখে জেনের মনে যে সামান্য কৌতূহল জাগেনি, তা নয়। তবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার আর অবকাশ পায়নি সে। কিন্তু, ঘণ্টা খানেক পরে, রাত সাড়ে এগারোটার দিকে জর্জের কাছ থেকে ফোন কল পেয়ে ও বাস্তবিকই অবাক হয়েছিল। ফোনে সাড়া দিতেই জর্জ হড়বড় করে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে যা বলতে থাকে তার মানে হচ্ছে এই—আজ রাস্তায় জেন যে মেয়েটাকে দেখেছে তার কারণে জর্জ একটা মিথ্যে স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটার মীমাংসার জন্যে ওরা অমন ঝগড়া করছিল। তার আশা জেন তাতে কিছু মনে করেনি। আর জেন যে জর্জকে ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখেছে সে কথা যদি সে কাউকে না বলে তবে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। জেন জানাল ওদের ব্যাপারটা নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না, সুতরাং কাউকে জর্জের কথা বলার প্রশ্নই আসে না। জর্জ যেন বিরাট স্বস্তি পেল। বলল, আগামীকাল খুব ভোরে সে কটেজে চলে আসবে জেনকে বাড়ি গোছগাছে সাহায্য করতে। কিন্তু শ্রীমানের এখনও কোন পাত্তা নেই।

জামাকাপড় ছেড়ে ওগুলো ছোট ক্লজিটের মধ্যে রাখার জন্যে দরজা খুলল জেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মত জমে গেল সে।

কেউ এটার মধ্যে ঢুকেছিল! ক্লজিটের মধ্যে জেন বেশি কিছু রাখেনি, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস এলোমেলো করে রাখা। বিস্মিত চোখে জেন ভেতরে তাকিয়ে আছে, এমন সময় ক্লজিট থেকে এক টুকরো কাপড় পড়ে গেল নিচে। তার মানে যে-ই এখানে অনধিকার প্রবেশ করুক, কাজটা সে করেছে কিছুক্ষণ আগে। হয়তো কয়েক মিনিট কিংবা কয়েক সেকেন্ড আগে।

জেনের গলা শুকিয়ে গেল। পাঁজরের সাথে হৃৎপিণ্ডটা দমাদম বাড়ি খেতে লাগল। হঠাৎ শব্দ শুনল, পা ঘষে ঘষে কে যেন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। আর

তখুনি জেন প্রচণ্ড অসহায়ের মত অনুভব করল চিৎকার করে সাহায্য চাইলেও দু'দশ মাইলের মধ্যে কেউ ওকে বাঁচাতে আসবে না।

জেন স্পষ্ট বুঝতে পারল কটেজে কেউ ঢুকেছে। সে এই রুমে এসেছে, জিনিসপত্র অগোছাল করেছে, তারপর আবার সবকিছু আগের মত সাজিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। নির্ঘাৎ কোন চোরের কাজ এটা। কারণ সবাই জানে উইক এন্ডে কটেজগুলোতে লোকজন আসে। জেনের কটেজে যে-ই হামলা করে থাকুক না কেন সে সবকিছু জেনে শুনেই এটা করেছে। এবং করেছে জেন আসার অনেক আগে।

কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো জেনের। বারবার ভাবতে চাইল কোন ছিঁচকে চোর এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে নিচে নামতে লাগল সে। যেভাবেই হোক ওকে রান্নাঘর থেকে একটা ছুরি খুঁজে বের করতে হবে আত্মরক্ষার জন্যে—

সিঁড়িগুলো মনে হলো যেন হাজার মাইল দূরে, কয়েক শতাব্দী সময় লাগল জেনের নিচে নামতে। ভয়ের চোটে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আসতে চাইছে, মৃগী রোগীর মত শরীর কাঁপছে। কোনমতে রান্নাঘরে ঢুকল জেন। ঝনঝন শব্দে বাসন কোসন ছড়িয়ে পড়ল ছুরি জাতীয় কিছু খুঁজতে গিয়ে।

জর্জ এখুনি এসে পড়বে, নিজেকে সান্ত্বনা দিল জেন। আর দরজা তো বন্ধই আছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটবে না। সে খামোকা ভয় পাচ্ছে। চুরির ঘটনাটা অবশ্যই কয়েকদিন আগে ঘটেছে, মনকে বোঝাতে চাইল জেন। কিন্তু মন যে মানে না। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে। রান্নাঘরের চারদিকে ভীতসন্ত্রস্ত চোখ বুলাল সে। একটা জানালার আলগা শার্সি দিয়ে একফালি সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। শুকনো ফুলগুলো থেকে ঝরে পড়া একটা বিবর্ণ পাপড়ির ওপর খেলা করছে সোনালি রশ্মি। ওদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল জেন, ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ।

মেঝে ভেজা! বিস্ফারিত দৃষ্টি ঝাঁকি খেয়ে উঠে এল টেবিলটার দিকে। টেবিলের ওপর মরা ফুলগুলো একটা জানালার কাছে রাখা। জেন স্পষ্ট বুঝল ফুলের বাটির পানি কেউ ফেলে দিয়ে আবার ভরে রেখেছে। এবং কাজটা করা হয়েছে আজকেই। হয়তো এক ঘণ্টা কিংবা কয়েক মিনিট আগে। কেউ রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। ওটার কাঁচ এমনি এমনি আলগা নয়, কেউ ওভাবে ওটা রেখে গেছে বুঝতে পেরে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল জেন। কেউ এই জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, ফুলগাছগুলো ধরেছে, ওপরের ক্লজিট খুলে তন্নতন্ন করে কিছু একটা খুজেছে, তারপর নিচে এসে মেঝে ভিজিয়ে ফুলগাছগুলোতে পানি দিয়েছে। কাজগুলো সে এমনভাবে করেছে যাতে কেউ তাকে সন্দেহ করতে না পারে।

কাজগুলো যে করেছে সে হয়তো খানিক আগে এখানেই ছিল। হয়তো এখন কাছে পিঠেই রয়েছে। জেনের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ইচ্ছে করল প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে।

পোকামাকড়ের কোরাস ছাড়া আশপাশে আর কোন শব্দ নেই। এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা জেনের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিতে লাগল। যে-ই এই কটেজে অনুপ্রবেশ

করুক না কেন সে নিশ্চই জানত এখানে আজ কেউ না কেউ আসবে। তবে জেন যে একা আসবে এটা নিশ্চই অনুপ্রবেশকারীর জানার কথা নয়। দুর্বৃত্তরা যদি সংখ্যায় একাধিকও হয় তবু ওরা নিশ্চই বাড়ির ভেতরে ওকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। বাইরে বসে কিভাবে জেনের ওপর হামলা করা যায় এরকম কোন প্ল্যানই ওরা করবে। যদিও এখন জানে জেন একা, কিন্তু নিশ্চই ওরা অপেক্ষা করবে কখন সে বাড়ির বাইরে আসে। কিন্তু তারা জানে না যে জেন তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। জেন যদি এখন বাইরে না বেরোয় আর ইতিমধ্যে জর্জ চলে আসে—

জেনের হাত-পা দ্রুত ঠাণ্ডা আর ভারী হয়ে এল। রান্নাঘর থেকে হেঁটে বেরুবার মত শক্তিও নেই। জানালার শার্সিটা টেনে নামানো প্রায় অসম্ভব বলে মনে হলো ওর কাছে। তারপরও সে কাজটা করল। এখন কাঁচ না ভেঙে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

নিজেকে শান্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল জেন। কিন্তু পারল না। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে চলেছে সে জর্জ যাতে তাড়াতাড়ি চলে আসে। জর্জ তার খুব ঘনিষ্ঠ কোন বন্ধু নয়। তবুও এই মুহূর্তে জর্জকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারলে খুব ভাল লাগবে জেনের।

জেন কাঁপা কাঁপা, প্রায় শক্তিশূন্য হাতে একটা আইস জ্যাক খুঁজে বের করল কাটলারির মধ্যে থেকে। একটা বাঁকানো ছুরিও চোখে পড়ল। দু'হাতে অস্ত্র দুটো তুলে নিল সে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি কেউ ওকে আক্রমণ করে তাহলে হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যাবে সে। তখন একটা জিনিসও কাজে লাগবে না।

পা থেকে জুতো খুলে ফেলল জেন। ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে এগোল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কুকুরের মত হাঁপাতে লাগল। নিচতলায় চারটে রুম। ঢোক গিলে, নিঃশব্দে রুমগুলো সার্চ করতে লাগল জেন। প্রায়ই ওর দম ফুরিয়ে গেল, বুক ব্যথা করতে লাগল। আর প্রতি মুহূর্তে ও কিছু না কিছুর শব্দ শুনতে পেল। নিচতলার বেডরুমে মাত্র ঢুকেছে জেন, হঠাৎ পেছনে কিসের যেন শব্দ হলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। একটা বই, কয়েক সেকেন্ড পর ধাতস্থ হয়ে বুঝতে পারল সে। চেয়ারের ওপর রাখা বইটা ওর শরীরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মেঝেতে পড়ে গেছে। সবচেয়ে কষ্ট লাগল ক্লজিটগুলো খুঁজতে। ক্লজিটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা ইঁদুর আরেকটু হলে ওকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। নিচতলার ক্লজিটগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে ওপরে উঠে এল জেন।

পেছনের রুমের শেষ ক্লজিটটা খুঁজে দেখছে জেন, এই সময় বাইরে বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। তারপরই সজোরে কড়া নাড়ল কেউ।

জেনের বুক ভরে উঠল প্রশান্তিতে। বিরাট একটা শ্বাস ফেলল ও পরম স্বস্তিতে। ওই তো জর্জ এসে গেছে। হঠাৎ কান্নার ডেলা পাকিয়ে উঠল গলার ভেতর, জবাব পর্যন্ত দিতে পারল না জেন। সামনের বেডরুমের দিকে দৌড়ে গেল সে। এক ঝটকায় জানালা খুলে ফেলল। চোখে টলমল করছে অশ্রু। জানালা দিয়ে মাথা বের করল ও, জর্জকে ডাকবে।

কিন্তু জর্জ নয় তো! কাদামাখা, বিশালদেহী ওই লোকটা কে? প্রকাণ্ড চেহারার লোকটার মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। লোকটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কান

খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে।

তারপর সে হাত বাড়াল দরজার নবের দিকে। আস্তে, নিঃশব্দে দরজা খোলার চেষ্টা করল।

দরজা বন্ধ, জানে জেন। তারপরও বুক ঢিবঢিব করে উঠল। লোকটা নব ঘোরানো বন্ধ করল। এবার দরজার গায়ে সে তার কাঁধ ঠেকাল। ধাক্কা দিতে লাগল। দরজার চৌকাঠ তীব্র শব্দে আপত্তি জানাল। জেনের মুখ হাঁ হয়ে গেল। চিৎকার দিতে চাইল ও, কিন্তু কর্কশ, বিদঘুটে একটা শব্দ শুধু বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে।

লোকটা ঝট করে ওপরের দিকে মাথা তুলল। সোজা হয়ে দাঁড়াল, অদ্ভুত গলায় বলে উঠল, 'আপনার খোবর···ফোনের খোবরাছে, ম্যা'ম।'

জেনের ইচ্ছে করল আবার চিৎকার করে ওঠে। এই ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটাই যে সেই দুর্বৃত্ত, মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলেছে সে। লোকটা গোপনে তার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, নিঃশব্দে দরজা খোলার চেষ্টা করেছে, আর এখন আবার দুর্বোধ্য স্বরে জেনের জন্য 'ফোনের খবর আছে' বলে তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

'ফোনের খবরে আমার কোন প্রয়োজন নেই,' কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল জেনের। 'তুমি চলে যাও।'

কিন্তু সে নড়ল না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জেনের দিকে। বিশাল গোঁফ তাঁর। মুখ প্রায় পুরোটা ঢেকে রেখেছে। গোঁফটাকে কৃত্রিম মনে হলো জেনের। কৃত্রিম কিন্তু ভয়ঙ্কর। এবং অশুভ।

গলা খাঁকারি দিল জেন, হাসার চেষ্টা করল, 'ফর গু-ডনেস শেক! তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ, তুমি একটা ফলস গোঁফ লাগিয়ে এভাবে আমাকে ভয় দেখিয়ে মোটেই ঠিক করোনি।'

কিন্তু লোকটার পাথরের মূর্তির মত চেহারায় কোন ভাবান্তর ফুটল না। সে সম্মোহনের দৃষ্টিতে একঠায় চেয়ে রইল জেনের দিকে।

কষ্ট হচ্ছে, তবুও জেন কথা বলতে লাগল। 'তোমাকে কিন্তু আমি চিনি। তুমি একটা ভাঁড়, তাই না? কিন্তু এমন ডাকাত সেজে লোকজনকে ভয় দেখানো মোটেই ঠিক কাজ নয়। এখন দয়া করে গোঁফটা ফেলে দিয়ে বলো তো সত্যি তুমি আমার কাছে কি চাও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বন্ধুরা এসে পড়বে। তোমাকে এভাবে আর অভিনয় না করলেও চলবে। ওরা এই এসে পড়ল বলে।'

জেন জঙ্গুলে পথটার দিকে তাকাল, মনে মনে প্রার্থনা করল জর্জ যেন এখুনি এসে পড়ে।

'আমার বন্ধুদের গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি,' নিচের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল মুখ করে বলল জেন। 'ওরা আসছে। এখন তুমি তোমার কৃত্রিম গোঁফটা ফেলে দিয়ে দয়া করে বলো আমার কাছে আসার উদ্দেশ্যটা কি তোমার।'

লোকটা নড়ে উঠল। থপথপ করে এগিয়ে গেল কটেজের কোণার দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর কর্নারের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

জেনের ইচ্ছে করল অজ্ঞান হয়ে যায়। পরক্ষণে কথাটা মনে পড়তে প্রায় উড়ে চলে এল সে দোতলায়। নাহ, দোতলার জানালা সব বন্ধ, কাঁচ নামানো। উঁকি দিল

জেন।

লোকটাকে দেখতে পেল সে। গুদামঘরের ছোট্ট ছাউনিটার দিকে যাচ্ছে। ওখানে জ্বালানী কাঠ আর নৌকোর জন্যে বৈঠা রাখা আছে, জানে জেন। লোকটা ছাউনির তলায় ঢুকে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল। হাতে একটা চকচকে কুড়াল। কুড়ালটা নিয়ে সে দৌড়ে গেল কটেজের দিকে। লোকটা চোখের আড়াল হওয়ার কয়েক সেকেন্ড পরেই রান্নাঘরের কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পেল জেন।

জেনের মুখ থেকে গোঙানির মত শব্দ বেরোল। ওর মুখ সাদা, দম বন্ধ হয়ে আসছে; সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। নিচতলা থেকে প্রচণ্ড শব্দ ভেসে এল। লোকটা ফুলের বাটিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছে। তারপরই রান্নাঘরে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেল জেন। ওর শরীর প্যারালাইজড রোগীর মত এখনও স্থির হয়ে আছে, নড়তে চড়তে ভুলে গেছে। চিন্তাভাবনাগুলো কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটার পায়ের শব্দ ক্রমশ কাছে সরে আসছে। এবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

গলা চিরে আর্তনাদ বেরোল জেনের। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দটা।

নড়ে উঠল জেন, দৌড় দিল সামনের বেডরুম লক্ষ্য করে। হাঁ করা মুখ থেকে একের পর এক ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে আসছে, সবেগে ছুটে গেল সে খোলা জানালা লক্ষ্য করে. চৌকাঠ ধরে ঝুলে পড়ল, পরক্ষণে নিজেকে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। পাঁচ ফুট ওপর থেকে মাটিতে পড়ল সে, অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল।

কি যেন ভাঙার বিকট শব্দ এসে আঘাত করল জেনের কানে। লোকটা সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছে, বেরিয়ে এসেছে সামনের দরজা দিয়ে। পিছু নিল সে জেনের। তার ছুটন্ত পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জেন।

জেন দৌড়াল। যেন বিকট এক দুঃস্বপ্ন ওকে তাড়া করেছে, জান বাজি রেখে তাই দৌড়াতে লাগল সে। ঘন জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে একবার পেছন ফিরল। লোকটা আর বিশ হাত দূরেও নেই, হাতে কুড়াল।

দিক পরিবর্তন করল জেন। খানিকটা যাওয়ার পর বুঝল আসলে সে লেক লক্ষ্য করে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে লেকের পাড়ে পৌঁছে গেল জেন। এক মুহূর্তের জন্যে পেছনে তাকাল। কুড়াল হাতে এখনও অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটে আসছে দানবটা। ঝাঁপ দিল জেন লেকের পানিতে।

এক ডুবে অনেকদূর এগিয়ে গেল জেন। ফুসফুস ফেটে যাওয়ার উপক্রম হতে ভুস্ করে ভেসে উঠল পানির ওপর। ভীত চোখে পেছন ফিরে চাইল। না, পিছু নেয়নি আগন্তুক। পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

লোকটা গুদাম ঘরের দিকে ঘুরে তাকাল। আবার জেনের দিকে ফিরল। বার দুই এরকম করল সে। তারপর এগিয়ে গেল গুদাম ঘরের দিকে। হাতে দুটো বৈঠা নিয়ে বেরিয়ে এল ছাউনির তলা থেকে। আরেক হাতে কুড়ালটা ধরে লেকের তীরে বাঁধা নৌকার দিকে এগোল সে।

জেন প্রাণপণে সাঁতরাতে শুরু করল। লোকটা বিশালদেহী। আর সে যত জোরেই সাঁতার কাটুক না কেন নৌকা দিয়ে লোকটা নিশ্চই তাকে ধরে ফেলবে। লেকের মাঝামাঝি জায়গায় গাছের ডগা উঁচিয়ে থাকতে দেখল জেন। সাঁতার প্রতিযোগিতার সিজনে মাটির সঙ্গে ওটাকে এখানে পুঁতে রাখা হয়েছে 'মার্কার' হিসেবে। গাছটাকে দেখে হতাশ হয়ে পড়ল জেন। এই জীবনে লেকের ওপারে পৌঁছুতে পারবে না বলে মনে হলো ওর। বাঁচার কোন আশাই দেখতে পাচ্ছে না ও। হয় লোকটা তাকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মারবে, নয়তো বৈঠা দিয়ে বাড়ি মেরে খুলি ফাটাবে। তারপর হয়তো সে চলে যাবে। জর্জ যখন আসবে দেখবে জেনের কোন খোঁজ নেই। ভাঙা কাঁচের জানালা আর ভাঙা ফুলদানির রহস্য সে জীবনেও ভেদ করতে পারবে না।

লোকটা নৌকায় উঠে পড়ল। বৈঠা বেয়ে আসতে লাগল জেনের দিকে। বৈঠার শব্দ নতুন করে শক্তি যোগাল জেনের শরীরে। শ্বাস বন্ধ করল সে, ডুব দিল পানির গভীরে।

একটা নির্দিষ্ট ছন্দের মত বৈঠা পড়ছে পানির গায়ে। শব্দটা ভয়ঙ্কর, অপ্রতিরোধ্য এবং নিষ্ঠুর মনে হলো জেনের কাছে।

প্রচণ্ড ব্যথায় মাথা দপদপ করছে, জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে ও। ভেতর থেকে কে যেন ওকে সতর্ক করে দিল, 'সাবধান, জ্ঞান হারালেই ডুবে মরবে।'

পানির আরও গভীরে চলে গেল জেন। পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে ভেসে উঠল। মুখ হাঁ করে বাতাস টানল। তারপর আবার ডুব দিল।

পানির নিচে চোখ মেলে চাইল জেন। লোকটার বৈঠার ওঠানামা স্পষ্ট দেখতে পেল সে পানির মধ্যে! অপ্রতিরোধ্য, নির্মম গতিতে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে বৈঠা দুটো উঠছে আর নামছে। সামান্য দূরে 'মার্কার' হিসেবে ব্যবহৃত পাইন গাছটার অস্পষ্ট আকৃতিটা চোখে পড়ল জেনের। সাঁতার দিল সে ওদিকে।

গাছটার পেছন দিকে চলে এল জেন। দাঁতে দাঁত চেপে ডুবে থাকল। নৌকাটাকে আবার চোখে পড়ল ওর। স্থির হলো নৌকাটা, আবার ঘুরল। লোকটা খুঁজছে তাকে। খুব সাবধানে ওপরে মুখ তুলল জেন। দেখল লোকটা নৌকা নিয়ে সোজা এদিকেই আসছে। আবার ডুব দিল সে। ফুসফুস ফেটে যায় যায় অবস্থায় নৌকাটা ঠিক তার মাথার ওপর এসে স্থির হলো, চক্কর মারল গাছটার চারদিকে, ডালগুলোর ফাঁক ফোকরে উঁকি দিল, তারপর অন্যদিকে চলে গেল।

বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ভেসে উঠল জেন। খুব সাবধানে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল।

লোকটা আরও মিনিট দশেক পাতি পাতি করে জেনকে খুজে বেড়াল। লেকের একটা জায়গাও বাদ দিল না খুঁজতে। তারপর যেন হতাশ হয়েই ফিরে চলল তীরের দিকে।

পাইন গাছের আড়ালে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জেন দেখল লোকটা তীরে নৌকা বাঁধল, তারপর সোজা কটেজের দিকে এগোল। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

জেনের প্রচণ্ড ইচ্ছে করল তীরে গিয়ে ওঠে। কিন্তু সাহস হলো না।

চারদিক আশ্চর্য সুনসান, নিস্তব্ধ। লেকের মাঝখানে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে

ভেসে থাকল জেন। একমনে প্রার্থনা করতে লাগল জর্জ হলওয়ের জন্যে। জর্জ যদি আসে তাহলে এখুনি ওই লোকটাকে তারা ধরতে পারবে।

জেনকে অবাক করে দিয়ে জর্জ হলওয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওর হাতে সেই কুড়ালটা। একটু আগে যে লোকটা জেনকে যে কুড়াল নিয়ে তাড়া করেছে অবিকল সেটার মত। জর্জ কুড়ালটা গুদাম ঘরে রেখে এল। লেকের তীরে এসে জুতো আর কোট খুলে ফেলল। প্যান্ট-শার্ট পরা অবস্থায় পানিতে নামল জর্জ। পুরো শরীর ভেজালো। তারপর নৌকায় উঠে বৈঠা দুটো হাতে তুলে নিল। তীরের কাছাকাছি নৌকো বাইতে লাগল। জেনের খোঁজে ইতিউতি চাইতে লাগল।

জেনের মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চিন্তা শক্তি সব যেন লোপ পেয়ে গেছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। যে লোকটা এতক্ষণ তাকে খুন করতে চেয়েছে সে আসলে জর্জ! কিন্তু জর্জ কেন ওকে খুন করতে চাইবে? সে তো জর্জের বন্ধু। ঘনিষ্ঠ না হলেও, ভাল বন্ধু তো বটেই। সে এর আগেও বার দুই জেনের বাড়িতে এসে দাওয়াত খেয়ে গেছে। কিন্তু সে তো পাগল নয় যে খামোকা জেনকে খুন করতে চাইবে। আর জেনকে খুন করেই বা কি লাভ তার?

জর্জ বলেছিল সে জেনের আগে এখানে আসবে। তার মানে সে সত্যি আগে এসেছে। তারপর নিজেকে ছদ্মবেশে সাজানোর জন্য ক্লজিট খুলে জামাকাপড় খুঁজেছে। এমন নিখুঁত ভাবে সে সবকিছু সাজিয়েছে যে জেন ঘুণাক্ষরেও তাকে খুনী হিসেবে কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু জর্জ কেন ওকে খুন করতে চাইছে? অনেক ভেবেও প্রশ্নটার জবাব মিলল না।

গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল জেন। গেস্টরা এতক্ষণে এসে পৌচেছে। তারা উঁচু স্বরে জেনকে ডাকতে লাগল। জেন এমন কেঁপে উঠল যে আরেকটু হলে ডুবে যাচ্ছিল। দেখল জর্জ দ্রুত বৈঠা বেয়ে তার অতিথিদের দিকে এগোল। তীরে উঠল জর্জ। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে কি যেন বলতে লাগল। তার নড়াচড়া দেখে জেনের মনে হলো সে বোধহয় বলছে সে যখন কটেজে পৌচেছে তখন দেখে কটেজে জেন নেই, খাঁখাঁ করছে বাড়ি। শুধু নৌকোটা লেকে ভাসছে। নৌকো থেকে কি যেন তুলে তার অতিথিদেরকে দেখাল জর্জ। ভাল করে লক্ষ করতে জেন দেখল ওটা তার পার্স। বেডরুমে সে তার পার্স ফেলে এসেছিল। জর্জ বলল জেনকে কোথাও না দেখে সে সাঁতরে নৌকোয় ওঠে এবং লেকের চারপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে যদি কোথাও জেনের চিহ্ন পাওয়া যায়...

অতিথিরা আবার গাড়িতে উঠল। ছুটল শহরের দিকে। ওরা নিশ্চই পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছে, ধারণা করল জেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় অতিথিদের দলটা এসে হাজির হলো। জর্জ একই রকম অভিনয় করল তাদের সঙ্গেও। তারপর, যেন প্রচণ্ড শোকে পাথর, এমন ভান করে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকল।

জেনের ইচ্ছে করল চিৎকার করে লোকজন ডাকে। কিন্তু জর্জের ভয় তাকে এমন অবশ করে রেখেছে যে গলায় কোন স্বর ফুটল না। দু'জন অতিথি নৌকায় উঠে জেনের 'লাশ'-এর জন্য ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি করল এদিক সেদিক। তারপর পাইন গাছের

দিকে আসতেই জেনকে চোখে পড়ল তাদের।

ভয়ে, আতঙ্কে আর ঠাণ্ডায় খড়ি মাটির মত সাদা হয়ে গেছে জেনের মুখ। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসছে। 'মৃত' জেনকে জীবিত দেখে ওরা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। তারপর একজন তাড়াতাড়ি তাকে নৌকোয় ওঠাল।

ওরা তীরে পৌছুতেই সবার আগে দৌড়ে এল জর্জ হলওয়ে। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যেন পরম স্বস্তি পেয়েছে। 'গুড লর্ড, জেন!' উত্তেজিত গলায় বলল সে। 'তোমাকে আমি সব জায়গায় খুঁজেছি।'

জেন তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে পেছন ফিরল সে। পুলিসের গাড়ি দেখে দৌড়ে গেল সে। ইউনিফর্ম পরা দুই পুলিস অফিসারের কাছে অশ্রুসজল কণ্ঠে, আতঙ্কে বারবার শিউরে উঠে পুরো ঘটনা খুলে বলল সে।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ম্যাডাম,' বলল একজন পুলিস অফিসার। 'এখন আর কোন ভয় নেই। আপনি এখন ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নিন, আমরা ততক্ষণে এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করি সে কেন আপনাকে খুন করতে চেয়েছে।'

জেন ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'জানি না! সত্যি জানি না। ও আমাকে এমনি এমনি খুন করতে চেয়েছে। আমি তো ওর বন্ধুই ছিলাম। গত রাতেও ওকে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে লিফট দিতে চেয়েছিলাম।'

কথাটা বলেই থমকে গেল জেন। নিজের অজান্তে হাত উঠে এল গলায়। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জর্জের দিকে। লক্ষ করল ওর শেষ কথাটা শোনামাত্র রক্তশূন্য হয়ে গেছে জর্জের মুখ, কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে।

'গত রাতে—গত রাতে,' তোতলাতে তোলাতে বলল জেন। 'আমি আমাদের চাকরানীটাকে তার বাড়িতে পৌছে দিতে যাচ্ছিলাম বৃষ্টির মধ্যে। ফেরার পথে মালবেরী এবং হেনস স্ট্রীটের ট্রাফিক লাইটের কাছে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি আমি। ওর সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল। সোনালি চুল মাথায়। মেয়েটার সঙ্গে ও ঝগড়া করছিল। আর মেয়েটা কাঁদছিল। আমি ওকে লিফট দিতে চাইলে ও আমার গাড়িতে উঠতে চায়নি। বরং কেমন চমকে গিয়েছিল। পরে আমাকে ফোন করে বলে আমি যে তাকে কাল রাতে রাস্তায় দেখেছি এ কথা যেন কাউকে না বলি।'

একজন পুলিস অফিসার লাফ দিয়ে উঠল। দ্বিতীয় জন জেনের দিকে দ্রুত মাথা ঘোরাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল।

'ম্যাডাম,' দ্বিতীয় অফিসার শান্ত সুরে বলল, 'আপনি বোধহয় ভুল করছেন। তবে হ্যাঁ, আজ সকালে আমরা এক স্বর্ণকেশীকে মালবেরী এবং হেনসস্ট্রীটের কাছাকাছি খুঁজে পেয়েছি। গত রাতে মেয়েটির সঙ্গে কে ছিল জানার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছি আমরা। কারণ কাল রাতে ওই স্বর্ণকেশীকে কেউ খুন করেছে।'

মরণ বাজি

আকাশটা যেন প্রকাণ্ড একটা নীল বাটি। পেতলের থালার মত ঝকঝকে সূর্য অসহ্য ধীরগতিতে এগোয় পুব থেকে পশ্চিমে। তীব্র উত্তাপে লোকটার চোখ জ্বালা করে। মনে হয় টগবগ করে ফুটছে মগজ। পেতলের থালাটা যতই পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে, ততই ম্লান হয়ে আসে আলো। একসময় কালো হয়ে ওঠে আকাশ, দু'একটা তারা জ্বলে ওঠে এখানে ওখানে। ঠাণ্ডা সাপের চোখে সারারাত ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে ওকে। সারাদিন প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ লোকটা রাতের আঁধারে বিশ্রাম নেয়। শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী দিনের অমানুষিক কষ্ট সহ্য করার জন্যে। লোকটার চারদিকে সীমাহীন নীলের বিশাল ব্যাপ্তি। ওটা সমুদ্র। যেন নীল আকাশটাকেই ধারণ করে আছে। প্রতিদিন একভাবে, ধীরে ঢেউগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছে দ্বীপটাকে। পঞ্চাশ বাই পনেরো গজ আয়তনের এই পাথুরে চত্বরকে সত্যি যদি দ্বীপ বলা যায়। ঢেউ-ভাঙার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না লোকটা। তবে জানে, পুরোপুরি নিঃসঙ্গ নয় সে। তার সঙ্গী আছে একজন। তবে বন্ধু নয়, শত্রু। সেই শত্রুর সাথে লোকটা এখন মরণ বাজিতে মেতে উঠেছে। তবে সে-কথা এখন নয়, পরে।

জাহাজডুবির পর লোকটাকে যখন ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে এল এই দ্বীপে, সে বেঁচে থাকার চেষ্টায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। দ্বীপে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। স্রেফ একটা পাথুরে টিলা যেন হঠাৎ করে ভেসে উঠেছে সাগরের বুক ভেদ করে। প্রথম যেদিন সে ভাসতে ভাসতে এই পাথুরে টিলায় এসে ঠেকল, তারপর থেকে প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে গেছে ধ্বংস হওয়া জাহাজ থেকে কিছু রক্ষা করা যায় কিনা। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কিছু খাবার জোগাড় করতে পেরেছে। পরিমাণ যদিও খুবই অল্প। ফলের ঝুড়িগুলো বাঁচাতে পারেনি একটাও। কয়েকটা খাবারের বাক্স ওর চোখের সামনে থেকে ভাসতে ভাসতে চলে গেছে, রক্ষা করতে পারেনি। আর ওর কাছ থেকে একশো গজ দূরে একটা ভেলা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছে ওটাকেও। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছে। তবে একেবারে ব্যর্থ হয়নি সে। কিছু কাঠ, দড়িদড়া, বিধ্বস্ত ভেলা থেকে ভেসে আসা একটা জলের ছোট পিপে, আর ক্যানভাসের একটা ব্যাগ বোঝাই কিছু বিস্কুট জোগাড় করতে পেরেছিল। কিন্তু দ্বীপের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছে সে। চারদিকে ধু-ধু সমুদ্র। মগজ ফুটানো সূর্যতাপ থেকে যে একটু আড়াল নেবে, সে উপায়ও নেই। কোথাও একটু ছায়া নেই। লোকটা প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছে এখান থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন আশাই তার নেই। যে জায়গায় সে এসে পৌঁছেছে সেটা সমুদ্রের বুকে একটা বিন্দু মাত্র। এটার অস্তিত্ব আদৌ কোন চার্টে আছে কিনা সন্দেহ। যদি থাকেও, দূর থেকে বিপজ্জনক ভেবে জাহাজগুলো হয়তো এটাকে এড়িয়ে যায়। সে ভেবেছিল তার কাছে যে কাঠ কুটো আছে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দূরবর্তী কোন জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই ভেবে সে দড়িদড়া দিয়ে

উদ্ধার করা কাঠগুলোকে একত্রিত করে একটা পাঁজার মত তৈরিও করেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে। ভেবেছে যখন আর উপায় থাকবে না তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে এটা করে দেখবে। সে তার সম্পদ গুনে দেখেছে। ক্যানভাসের ব্যাগে বিস্কুট পেয়েছে বাইশটা। যদিও নোনা পানিতে ওগুলো ভিজে গেছে। কিন্তু খাওয়া চলে। সুস্বাদু জলের ছোট্ট একটা পিপে। ভাঙা মাস্তুল থেকে ছুটিয়ে আনা কিছু দড়ি, কয়েক টুকরো কাঠ আর কোমরের বেল্টে গোঁজা ষাটটা ডলার। ব্যস, এই-ই সব। ভাঙা ভেলার একটা তক্তার গা থেকে বড়সড় একটা পেরেক উঠিয়ে এনেছে। এটা দিয়ে কয়েকবার পাথরে আঘাত করতেই ঝিলিক দিয়ে উঠেছে আগুন। কিন্তু রান্না করার মত কিছুই নেই এই পাথুরে দ্বীপে। তবু সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে পেরেকটা। লোকটা জানে তার কাছে যে খাবার আছে তার পরিমাণ নিতান্তই কম। সুতরাং এখন থেকেই খুব হিসেব করে খরচ করতে হবে। প্রচণ্ড খিদে তাকে দুর্বল করে দেবে, জানে সে, তবে একটু একটু করে খেলে বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারবে। বলা যায় না, হয়তো এরই মধ্যে সে এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

সূর্য লোকটাকে ঝলসে দেয়। পায়ের নিচে মাটি নেই। পাথুরে মেঝে উৎকট উল্লাসে দাঁত বের করে হাসছে। সূর্য যত ওপরে উঠতে থাকে, ততই তেতে গরম হয়ে উঠতে থাকে জীর্ণ, চিড়ধরা পাষাণ দ্বীপ। দুঃসহ তাপে ঝলসাতে থাকে লোকটা, হাঁপাতে থাকে জিভ বের করা কুকুরের মত। চোখে হুল ফোটার তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও আকুল হয়ে চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে জাহাজের প্রত্যাশায়। যদিও সেই আশা খুবই কম। ভোরবেলা সে তার অত্যন্ত সামান্য খাবার থেকে অল্প কিছু খেয়ে সারাদিনের নরক যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নেয়। সূর্য যখন তাকে সারাদিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে প্রায় নিঃশেষ করার পর ডুব দেয় সাগরের বুকে, তখন সে সামান্য, খুবই সামান্য একটু জল খায়। আর সারারাত ধরে শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী দিনের কঠোরতর সংগ্রামের জন্যে।

এভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর, সম্ভবত সপ্তম কি অষ্টম দিনে লোকটা টের পেল ইঁদুরটার উপস্থিতি। ইঁদুরটা বিশাল। জাহাজেই ছিল। জাহাজডুবির পর সেও ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছে। এবং প্রথম দিনেই টের পেয়ে গেছে লোকটার উপস্থিতি। আর একই সাথে বুঝতে পেরেছে এখানে টিকে থাকতে হলে একটামাত্র জিনিসের ভয়ঙ্কর প্রয়োজন—খাদ্য। আর তারপরই সে চুপিসারে হামলা চালিয়েছে লোকটার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনের ওপর।

লোকটা সেদিন বিস্কুট খাওয়ার জন্যে ব্যাগটা হাতে নিয়েছে, সাথে সাথে ঝুরঝুর করে কি যেন পড়ে গেল পায়ের কাছে। ভয়ানক চমকে উঠে দেখল ব্যাগের গায়ে একটা বড়সড় ফুটো। বিস্কুটের সাদা গুঁড়ো বেরিয়ে পড়ল ওটা থেকে, হাওয়ায় উড়ে গেল। আধখাওয়া একটা বিস্কুট পড়ে আছে পায়ের কাছে। ছোট ছোট দাঁতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাণ্ডটা কে ঘটিয়েছে বুঝতে এক সেকেন্ড সময়ও লাগল না তার। দম যেন বন্ধ হয়ে এল। আধ খাওয়া বিস্কুট আর ব্যাগের ফুটোর দিকে তাকিয়ে ভয়ের শিরশিরে একটা ঢেউ উঠল শিরদাঁড়া বেয়ে। সাথে সাথে সে গুনতে বসল ভেতরের জিনিসগুলো। তার হিসেব মত উনিশটি বিস্কুট

থাকার কথা। কিন্তু আছে মাত্র ষোলোটি, আর পায়ের কাছে আধ খাওয়া একখানা। দারুণ আতঙ্কে সে হিসেব করে দেখল তার এক সপ্তাহের খাবার খেয়ে সাতদিনের আয়ু কমিয়ে দিয়েছে শয়তানটা। বিস্কুটগুলো হিসেব করা ছিল প্রতিদিন কতটুকু খেলে কদিন চলবে। কিন্তু এতবড় বিপর্যয় ঘটে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি সে। বাধ্য হয়েই এখন থেকে তাকে আগের চেয়ে অনেক কম খেতে হবে। সাবধানে ব্যাগের ফুটো একটা দড়ি দিয়ে বাঁধল সে। তারপর ওই পরিত্যক্ত আধখানা বিস্কুটই চিবোতে লাগল, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সে গিলল খাবারটা। খেতে খেতে টকটকে লাল চোখে হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল দিগন্তের দিকে। কিন্তু দিগন্ত জোড়া নীল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। রাত এল। অল্প কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ব্যাগটা একটা কাঠের টুকরোর সাথে বাঁধল, পাথরের খাঁজে ঢুকিয়ে দিল টুকরোটা। শূন্যে ঝুলতে লাগল ব্যাগ। সবকিছু আরেকবার চেক করে দেখে ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সে দেখল ব্যাগটা পড়ে আছে মাটিতে। ইঁদুরটা কেটে ফেলেছে দড়ি। বিস্কুট আছে মাত্র বারোটা। ব্যাগ থেকে গজ দুয়েক দূরে কয়েকটা টুকরো পড়ে আছে। পুরোটা খেতে পারেনি বলে অর্ধেকটা খেয়েই চলে গেছে।

প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগে দাউ দাউ জ্বলে ওঠে লোকটার শরীর। দ্বীপের প্রতিটি ইঞ্চি এবার সে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করে। জায়গাটা ছোট। একদিকে দেড়শো ফিট, অন্যদিকে পঁয়তাল্লিশ ফিট এটার বিস্তৃতি। এমন কোন আড়ালও নেই যে কেউ লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু ইঁদুরটা খুব সহজেই পাথরের খাঁজ, ফাটল কিংবা অগভীর খাদে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। খুঁজতে খুঁজতে লোকটার হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট্ট গর্তের মত একটা জায়গা। জায়গাটার এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিস্কুটের টুকরো। তার বুঝতে অসুবিধে হলো না ইঁদুরটা এখানে বসে চুরি করা জিনিসগুলো খেয়েছে। এখানে যে টুকরো টাকরা ছড়িয়ে আছে তা দিয়ে লোকটার অন্তত তিনদিন দিব্যি চলে যেত। লোকটার খুব রাগ হলো। সেই সাথে কৌতূহলও হলো, ইঁদুরটা পিপাসা মেটায় কিভাবে। লক্ষ করে দেখল পাথরের ফাটলগুলোর ভেতরের দিক এই চাঁদি ফাটানো দুপুরেও চমৎকার ঠাণ্ডা। রাতের বেলা যখন শিশির পড়ে ইঁদুরটা নিশ্চয়ই পাথর থেকে চেটে চেটে সেই শিশির খেয়ে তৃষ্ণা মেটায়। এভাবে একটা ইঁদুরের পক্ষে অনেকদিন বেঁচে থাকা সম্ভব। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

অনেক খুঁজেও সন্ধান মিলল না ইঁদুরটার। এমনকি এক মুহূর্তের জন্যেও তার টিকিটি চোখে পড়েনি লোকটার। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেল সে।

সেই রাতে প্রচণ্ড রাগে লোকটার আর ঘুম এল না। তার কাছে পেরেক বসানো একখানা তক্তা এখনও আছে। তবে মুগুর হিসেবে ব্যবহার করার মত খুব একটা যুৎসই নয়। কিন্তু এটাই কাজে লাগাবে ঠিক করল সে। ব্যাগের মুখ খুলে ফেলল। টোপ হিসেবে সাজিয়ে রাখল সামনে। কালো আকাশের সামিয়ানায় তারারা জ্বলে উঠেছে। ঠাণ্ডা চোখে, অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। লোকটার মনে হলো তারাগুলো তার দুর্দশা দেখে খুব মজা পাচ্ছে। তীব্র বিতৃষ্ণায়

মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ওর; হাতের মুঠো আপনাআপনি শক্ত হয়ে ওঠে, বিড়বিড় করে অভিশাপ দেয় সে। তার কানে শুধু ভেসে আসে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মনে প্রবল ঘৃণা নিয়ে ইঁদুরের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে···।

দারুণ ক্লান্ত শরীরে চোখ কখন লেগে গেছে জানে না লোকটা, হঠাৎ ধপ্ করে একটা শব্দ শুনে জেগে উঠল সে। মুগুরটা খসে পড়েছে হাত থেকে। পরক্ষণে সে ছোট ছোট পায়ে দৌড়ে পালাবার শব্দ শুনতে পেল। দেখল ব্যাগটা যেখানে ছিল, সেখান থেকে আরও ফুট দুয়েক সামনে সরে গেছে। ইঁদুরটা চেষ্টা করেছিল ওটা তার গোপন জায়গায় সরিয়ে নিতে। কিন্তু হঠাৎ সে জেগে ওঠায় সুযোগ পায়নি।

শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। সে বুঝতে পারছে এই দ্বীপে যতদিন ওরা দু'জন আছে আর আছে এই বিস্কুটগুলো, ততদিন ইঁদুরটা তাকে জ্বালিয়ে মারবে। সেই সাথে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হলো, এই দ্বীপে একসাথে দু'জনের বেঁচে থাকা চলবে না। তাকে বাঁচতে হলে ইঁদুরটাকে মরতে হবে। আর যদি সে মারা যায়···। আর ভাবতে পারে না। তার চিন্তাশক্তিও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সকালে খোঁজাখুঁজির সময় সে পাথুরে মেঝেতে একটা ফাঁপা গর্ত দেখতে পেয়েছিল। ওই গর্তটার মধ্যে সে বিস্কুটের ব্যাগটা রেখে তার ওপর শরীর মেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে না হটিয়ে খাবার স্পর্শ করার এখন আর কোন সুযোগ নেই প্রতিপক্ষের। ক্লান্তিতে আবার চোখ বুজে এল তার। বারবার দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। দুঃস্বপ্নের মধ্যেও তার মাথায় একটা চিন্তা বারবার ঘুরপাক খেতে থাকে—ইঁদুরটাকে অবশ্যই মরতে হবে, নয়তো তাকে···।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকটা তার খাবারের সামান্য অংশ খেতে শুরু করল। বিস্কুটের ভগ্নাংশ চিবোয় ধীরে ধীরে। প্রতিটি কণা চেটেপুটে খায়। সূর্য তেতে ওঠে ক্রমশ। চোখ ঝলসে যায়। তীব্র উত্তাপে দগ্ধ হতে হতে নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকে সে দিগন্তের দিকে। সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে নেয় গা। কিন্তু তাতে কি আর তৃষ্ণা মেটে! তেষ্টা চরমে উঠলে এক ঢোক জল খায়। ধীরে ধীরে ক্লান্ত সূর্য ডুবে যায় পশ্চিমাকাশে। কাকের ডানার মত আঁধার নামে ঝপ্ করে। ফুটে ওঠে নক্ষত্ররাজি। আর ঠিক তখন, প্রথম বারের মত লোকটা দেখতে পায় তার শত্রুকে। দ্বীপ থেকে গজ দশেক দূরে, একটা পাথরের দিকে সাঁতরে যাচ্ছে ইঁদুরটা। সাঁতরাতে সাঁতরাতে পৌঁছে গেল সে পাথরটার কাছে। চেষ্টা করছে ওপরে উঠতে। লোকটা চোখে অসীম ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। একসময় পাথরটার গায়ে উঠে পড়ল ইঁদুরটা। বার কয়েক গা ঝাড়া দিয়ে সুড় সুড় করে ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে ইঁদুরটা খচরমচর শব্দ তুলে। হঠাৎ পায়ের শব্দ থেমে গেল। খানিক পরে অন্যরকম একটা শব্দ শুনতে পেল লোকটা। কি যেন খাচ্ছে ইঁদুরটা। কেমন একটা পচা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল লোকটার। কি খাচ্ছে ব্যাটা? সম্ভবত কোন মরা মাছ ঢেউয়ের ধাক্কায় ঠেকেছিল পাথরের চুড়োয়, ওটারই সদ্ব্যবহার করছে সে এখন। খুব হিংসে হলো লোকটার। সারাদিনে তার কিনা একটুকরো বিস্কুটও জোটে না ভাল করে, পোকাভরা জল, তাও ফুরিয়ে যাবার ভয়ে

দু'এক-ঢোকের বেশি খাওয়ার জো নেই, কত কষ্টে সে বেঁচে আছে। আর শয়তানটার জলের তো কোন কষ্ট নেই-ই, এখন আবার আরাম করে খাচ্ছে, দেখো! খাওয়ার শব্দ অসহ্য ঠেকছে তার কাছে। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল, দুর্বল আর ক্ষুধার্ত দেহটা মেলে দিল শক্ত পাথুরে মেঝেতে। মিটমিটে তারাগুলোর দিকে ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কল্পনায় দেখতে পেল ইঁদুরটার নাদুস্ নুদুস, নধর বাদামী দেহখানা। হঠাৎ ওটা চোখের সামনে আগুনের আঁচে ঝলসানো সুস্বাদু রোস্টে পরিণত হলো। জিভে জল এসে গেল তার। পেটের ভেতরটা দারুণ মোচড় দিয়ে জানান দিল সে ভয়ানক ক্ষুধার্ত। ইঁদুরটাকে যদি সে মারতে পারে তাহলে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আরও কয়েকটা দিন বাড়বে। আর যদি নিজেই মরে যায়, বেঁচে যাবে ইঁদুরটা। কিন্তু সে কেন মরবে? এখানে কোন আপস নেই। এটা জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন।

আবারও সকাল হয়। বিশাল বাটির মত নীল আকাশে ঝকঝকে সূর্য সারাদিন উত্তাপ ছড়িয়ে ডুবে যায় দিগন্তে। রাত নামে। একে একে জ্বলে ওঠে তারারা। সেই একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লোকটার দিকে। আজ সারাদিন লোকটা শুধু ইঁদুরটার কথা ভেবেছে। ভেবেছে কিভাবে ওটাকে কব্জা করা যায়। দ্রুত আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। যা করার এখনই করতে হবে। পরে আর সময় থাকবে না। একবার সে দারুণ ঝুঁকি নিয়ে দিনের খাবারটা না খেয়ে ইঁদুরটাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু ফাঁদে পড়েনি ধূর্ত শয়তান। সুযোগ বুঝে বিস্কুটের টুকরোটা নিয়ে ঠিকই পালিয়েছে। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে লোকটার। ব্যর্থ হয়েছে বলে নয়, বিস্কুট হারাবার দুঃখে। আর অভিসম্পাত করেছে শত্রুকে।

পরদিন লোকটা অনেক কষ্টে একটা তীর আর ধনুক তৈরি করে ফেলল। যন্ত্রপাতির অভাবে নিখুঁত হয়নি অস্ত্র দুটো। বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। কিন্তু কাজ চলবে বলে মনে হয়। তীর ধনুক তৈরি করার পরবর্তী তিনটে দিন সে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। হাঁটার শক্তি নেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হলো। কিন্তু নাগালে পেল না। লোকটার শক্তি ফুরিয়ে গেছে, টের পেয়েছে ইঁদুরটা। আগের চেয়ে অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে সে। এখন লোকটার সামনে দিয়েই ফুড়ুৎফাড়ুৎ দৌড় দিচ্ছে।

এভাবে ব্যর্থ দুটো দিন কাটল। কিন্তু তৃতীয় দিন মিলে গেল সুবর্ণ সুযোগ। ইঁদুরটাও অনাহারে ভুগতে ভুগতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল একটা পাথরের আড়ালে। লোকটার চোখে পড়ে গেল সে হঠাৎ করে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বুকে হেঁটে এগোল সে। শ্বাস ফেলছে খুব আস্তে। ইঁদুরটার আরও কাছে চলে এল। সেই আগের জৌলুস আর নেই শরীরে। শুকিয়ে গেছে অনেক। বুকের খাঁচা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দ্রুত ওঠানামা করছে বুক নিঃশ্বাসের তালে। লোকটা স্থির দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করতে করতে হাত বাড়াল পিঠে বাঁধা তীরের দিকে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছে জানত না। তীরটা ধনুকে লাগাতে রীতিমত হিমশিম খেয়ে গেল সে। চোখে সর্ষেফুল দেখল। বুকের ভেতর দমাদম হাতুড়ি পিটছে। চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ওর, সারামুখে ঘাম। প্রাণপণ চেষ্টায় ধনুকে তীরটা লাগাল সে। ছিলা টেনে

ছেড়ে দিল। ভেবেছিল লাগবে না। কিন্তু লাগল। দারুণ চমকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ইঁদুরটা। কিচমিচ করতে করতে দৌড়ে পালাল। কোন ক্ষতি হয়নি ওর। আসলে অসম্ভব শারীরিক দুর্বলতার কারণে তীরটা জোরে ছুঁড়তে পারেনি। তাই এযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেছে জানের শত্রু। ওকে পালাতে দেখে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল লোকটা। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দরদর ধারায় জল পড়ছে চোখ বেয়ে। হেরে যাচ্ছে সে। মরণ বাজিতে হেরে যাচ্ছে।

দিনদুয়েক পর লোকটার পানীয় জল আর খাবার সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল। সে মেঝেতে পিঠ দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মহাশূন্যের দিকে। রাত এল। একটুও খিদে লাগছে না তার। এমনকি তেষ্টাও না। মাথাটা খুব হালকা ঠেকছে। শরীর ভীষণ দুর্বল। পেটের পেশীতে কোন খিঁচুনি নেই। ভাবলেশহীন মুখে আকাশের তারা দেখতে থাকে সে। কোন ভাবনাই যেন কাজ করছে না মনের মধ্যে। আসলে চিন্তা করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে সে।

হঠাৎ ছোট্ট একটা শব্দ শুনতে পেল লোকটা। পাশ ফিরল। তারার আলোয় অস্পষ্ট একটা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। নড়ছে। এগিয়ে আসছে এদিকে। এক মুহূর্ত পরেই বুঝতে পারল ওটা তার চিরচেনা শত্রুপক্ষ। লোকটা কোন শব্দ করল না। নড়লও না একবিন্দু। এগিয়ে আসছে ওটা তার দিকে। হঠাৎ সামান্য কেঁপে উঠল লোকটার শরীর। থেমে গেল ইঁদুরটা। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওকে। লোকটা দুর্বলভাবে হেসে উঠল। ইঁদুরটা অধৈর্য ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। সমস্ত দ্বীপে খুঁজেও আজ একটা দানাও জোটেনি পেটে। ভয়ানক ক্ষুধার্ত সে। প্রচণ্ড খিদে ওকে শুধু উন্মাদ করতে বাকি রেখেছে। সামনেই রয়েছে লোভনীয় খাবার। কিন্তু ও জানে লোকটা মরে না যাওয়া পর্যন্ত এই খাবারে হাত দিতে পারবে না। কিন্তু আর কত? আর কতক্ষণ লাগবে ওর মরতে? অসহিষ্ণুভাবে সে একটু নড়ে উঠল।

'না,' লোকটা যেন ওর মনোভাব বুঝতে পেরেই কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'এখন না। যে আগে মরবে সেই শুধু খাবার খেতে পারবে। আমি মরিনি এখনও...'

লোকটার গলা থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ সচকিত করে তুলল ইঁদুরটাকে। দ্রুত পিছিয়ে এল। কিন্তু লোকটা চুপ হয়ে যেতেই আবার এগোল। আরেকটু বেশি কাছে চলে এল। লোকটার শরীর নড়ে উঠতেই থমকে গেল। লোকটার নজর এই মুহূর্তে ওর দিকে নেই। সে বহু কষ্টে তার শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাঠের পাঁজার দিকে। অনেকদিন আগে সে কাঠকুটো দিয়ে পাঁজাটা তৈরি করেছিল। ভেবেছিল শেষ চেষ্টা হিসেবে এটাকে ব্যবহার করবে। আর কোন উপায় নেই ওর। একমাত্র আগুনই পারবে ক্ষুধার্ত শয়তানটার হাত থেকে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও রক্ষা করতে। পকেট থেকে পেরেক বের করে ঠুকতে লাগল পাথরের গায়ে। জ্বলে উঠল ফুলকি। স্ফুলিঙ্গ দেখে ভয় পেল ইঁদুর। দৌড়ে পালাল। নিভে যেতেই আবারও পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। লোকটা পেরেক ঘষতেই ঝিলিক দিল আগুন। আবারও দৌড় দিল ইঁদুরটা। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? প্রতিবার শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে পেরেক ঠুকতে হচ্ছে ওকে। দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথা। জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হয়েছে। ইঁদুরটা এখন আর দৌড়ে

পালাচ্ছে না। পাঁচ ফুট দূরে বসে আছে অধৈর্যভঙ্গিতে। খচমচ করে পাথরে আঁচড় কাটছে। চোখে অসীম খিদে। শিকারকে কখন বাগে পাবে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

লোকটা চলে এসেছে কাঠের পাঁজার কাছে। বারকয়েক চেষ্টার পর আগুন ধরে গেল শুকনো কাঠে। অনুকূল বাতাস পেয়ে মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ইঁদুরটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে পিছু হঠল। ধীরে ধীরে আগুনের শিখা আরও দীপ্যমান হয়ে উঠল। ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল। এখন যেন গর্জন শুরু করেছে। মাটি থেকে কমপক্ষে পনেরো ফুট ওপরে নাচছে। তারপর বিশ ফুট। লাল হলদে রঙের লকলকে আগুনের জিভ থেকে ঘন কুয়াশার মত ধোঁয়া মাথার ওপরের আকাশটা ঢেকে ফেলল। লোকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল আগুনের লেলিহান শিখার দিকে। 'খোদা, এই ধোঁয়া আর আগুন যেন কারও চোখে পড়ে!' মনে মনে প্রার্থনা করল সে।

ইঁদুরটা আগুনের প্রচণ্ড তাপে টিকতে না পেরে কোথায় যেন লুকিয়েছে। আগুন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হতে হতে এক সময় নিম্নমুখী হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। এক সময় ভোর হলো। পুবাকাশে লাল সূর্যটা উঁকি দিল। নিভে গেছে আগুন। ছাই থেকে এখন শুধু থকথকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সারারাত লোকটা দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। খালি ভয় হয়েছে কখন না জানি ইঁদুরটা আক্রমণ করে বসে। আগুন পুরোপুরি নিভে যেতেই শ্রীমান বেরিয়ে এল লুকোনো জায়গা থেকে। এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। ঠিক তখুনি, যেন স্বপ্নের ঘোরে সে শুনতে পেল কাছে কোথাও নোঙর করার শব্দ। কয়েকজন মানুষের গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে! লোকটার জানার কথা নয়, গতরাতে ওর জ্বালানো অগ্নিশিখা এক জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওই জাহাজের লোকেরা ভেবেছিল এদিকে বোধহয় কোন জাহাজে আগুন লেগেছে। সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে ওরা। তখনই চোখে পড়ে খুদে দ্বীপটাকে। আর লোকটাকে।

লোকটাকে ওরা নৌকো করে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের জাহাজে। তখনও জ্ঞান আছে তার। নৌকো দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় সে তাকাল এদিকে। দেখতে পেল ইঁদুরটাকে।

ইঁদুরটা কিচমিচ করতে করতে দৌড়াদৌড়ি করছে। প্রচণ্ড হতাশায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে ওটা। শিকার এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি। শিকার যতই দূরে সরে যাচ্ছে বেঁচে থাকার সর্বশেষ অবলম্বনটুকু ততই ফুরিয়ে যাচ্ছে···

'আ-আমার পকেটে কিছু টাকা আছে,' গুঙিয়ে উঠল লোকটা। 'ষাট টাকা। আ-আমি একটা বাজিতে হেরেছি,' একটু থামল সে। তারপর শ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি এই টাকা দিয়ে কিছু খাবার কিনে ওখানে রেখে আসতে চাই···ইঁদুরটার জন্যে। ও বাজিতে জিতেছে। আ-আমি—আমার এভাবে হেরে গিয়ে পালানো ঠিক হচ্ছে না···'

লোকটাকে নিয়ে জাহাজীরা পৌঁছে গেল জাহাজে। সাবধানে ওকে ডেকে ওঠাল। দুর্বলভাবে তখনও সে বলে চলেছে ইঁদুরটার জন্যে কিছু খাবার দিয়ে

আসতে। অসুস্থ লোকটার জন্যে দয়াপরবশ হয়েই জাহাজীরা আবার ফিরে চলল দ্বীপে। সাথে নিয়ে গেল একশো পাউন্ড বিস্কুটের একটা বড় প্যাকেট। সাবধানে একটা উঁচু জায়গায় রাখল প্যাকেটটা যাতে ঢেউ ভাসিয়ে নিতে না পারে। লোকগুলো আবার ফিরতি পথ ধরতেই লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এল ইঁদুরটা। হামলে পড়ল খাবারের ওপর। গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

লোকটাকে জাহাজীরা জানাল তারা ঠিকঠাক মত খাবার পৌছে দিয়ে এসেছে। লোকটা নিস্তেজভাবে হাসল একটু। চোখ বুজে এল দারুণ ক্লান্তিতে। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল বাজিতে হেরে গেছে সে। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অন্যায়ভাবে ঠকিয়েছে।

মাকড়সা

ভগ্নপ্রায় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে পেড্রো। প্রতিটি পা ফেলছে অত্যন্ত সাঁবধানে। যেন শব্দ না হয়। এক হাতে শক্ত করে ধরে আছে টিনের একটা পাত্র। অন্য হাত দিয়ে পচা কাঠের রেলিং ধরে এগোচ্ছে। ছোট্ট হাতের মুঠোয় বড়সড় পাত্রটা ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে।

ওপরে উঠে এল পেড্রো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। সাবধানে নিচের দিকে তাকাল। নাহ্, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। ভাল করেই জানে, চিলেকোঠার এই নড়বড়ে ছাদ তার জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাবা-মা যদি কোনদিন জানতে পারে গোপনে নিয়মিত এখানে আসে সে···ভাবতেই শিউরে উঠল পেড্রো। কিন্তু ওর কোন উপায় নেই। প্রিয় বন্ধুকে খাবার দিতে হলে এখানে আসতেই হবে। ধরা পড়ার ভয় যতই থাকুক।

পেড্রো চিলেকোঠার দরজায় আস্তে ধাক্কা দিল। সামান্য ধাক্কাতেই ক্যাচকোঁচ করে তীব্র আপত্তি জানাল দরজাটা, যেন খুব ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু পেড্রো জানে এই শব্দ শুনেই ওর প্রিয় বন্ধু বুঝতে পারবে সে এসেছে। সাথে সাথে দেখতে চলে আসবে পেড্রো আজ তার জন্য কি রসাল খাবারের ব্যবস্থা করেছে।

ভাঙা জানালার শার্সির ফাঁক দিয়ে প্রচুর আলো আসছে। সাবধানে পা ফেলে ভেতরে ঢুকল পেড্রো। আধপচা কাঠের কড়িবর্গা থেকে কেমন গুবরে পোকা গুবরে পোকা গন্ধ আসছে। যদিও ওর জানা আছে এখানে জ্যান্ত কোন পোকামাকড়ই নেই। সব তার বন্ধু খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। পেড্রোর পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে এল। ধীরে ধীরে, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মেঝেতে পা ফেলে এগিয়ে এল। তার গোলাকার কালো শরীরটা দেখতে বড়সড় একটা প্লেটের মত। লম্বা, রোমশ পা দুটো অবিকল কাঁকড়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। নিঃশব্দে, দ্রুতচরণে সে যখন চলে, বোঝাই যায় না পাগুলো আদৌ মেঝে স্পর্শ করছে কিনা। এই মুহূর্তে সে ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল দুই চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পেড্রোর হাতে ধরা টিনের পাত্রটার দিকে। বন্ধুকে দেখে বরাবরের মত মুগ্ধ হয়ে পেড্রো ফিসফিস করে, যেন ষড়যন্ত্র করছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'এই যে, মাকড়সা ভাই, দেখো আজ তোমার জন্য কি জিনিস নিয়ে এসেছি।' পাত্রটা উপুড় করল সে। জ্যান্ত কতগুলো পিঁপড়ে বেরিয়ে এল ওটা থেকে। 'তুমি এগুলো পছন্দ করো, তাই না?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল পেড্রো। কিন্তু পেড্রোর কথা তার কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না। সে এখন বিপুল উদ্যমে খাবার খেতে ব্যস্ত। ধারাল চোয়ালের আঘাতে দ্রুত সংহার করে চলেছে পিঁপড়েগুলো। পেড্রো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তুমি ভারি লোভী, মাকড়সা ভাই,' মৃদু কণ্ঠে ভর্ৎসনা করল সে। 'আর খাও-ও খুব তাড়াতাড়ি। অথচ ওগুলো ধরতে আমার জান বেরিয়ে গেছে।'

*

'ছেলেটা গেল কোথায়?' বারের দরজাটা খোলার আগে অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে অসন্তোষে বিড়বিড় করে উঠল মারিয়া। কাউন্টারে, একাধারে বার ও রিসেপশন ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেখানেও পেড্রো নেই। স্বামী জোসেফ কাউন্টার সাফ করতে ব্যস্ত। ওর নগ্ন, পেশীবহুল পিঠের দিকে তাকিয়ে পুলক অনুভব করল মারিয়া। বিয়ের পর এতগুলো বছর পার হয়ে গেছে অথচ পরস্পরের প্রতি ওদের তীব্র আকর্ষণ ও ভালবাসা একটুও কমেনি। ওরা খুব সুখী দম্পতি। তবে সুখটা ষোলোকলায় পূর্ণ হত যদি নদীর ধারের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকতে পারত। এখানকার জীবন বড্ড গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীন। এখানকার বিবাহিতা মেয়েগুলো সব এক ধাঁচের। নোংরা পোশাক পরে, ভদ্রতা জানে না। একেবারে গাঁইয়া। কিন্তু মারিয়া ওদের সবার থেকে আলাদা। এবং সুন্দরী।

'পেড্রোকে দেখেছ?' মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

'না, কারিশমা।'

'এই জায়গা,' বলল সে। 'ভেঙে পড়ছে। বাড়িটার সবকিছুই নড়বড়ে। এটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা অসম্ভব একটা ব্যাপার। এই ভূতুড়ে বাড়ির কোথায় গিয়ে সেঁধুল পেড্রো।'

জোসেফ মুচকি হাসল। মারিয়া পাশ দিয়ে যেতেই ওকে ধরে ফেলল, 'চিন্তা কোরো না, ঠিকই একদিন আমরা এর চেয়ে ভাল বাড়িতে উঠে যাব।' মারিয়ার ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল সে। 'এখন একটা চুমু খাও দেখি, ডার্লিং,' আদুরে গলায় বলল সে।

'তাড়াতাড়ি জোসেফ—তাড়াতাড়ি এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো আমাদের,' মিনতির সুরে বলল মারিয়া। 'এই নরকে বাস করতে একটুও ইচ্ছে করে না আমার।' কথা বলতে বলতে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ধস্তাধস্তি করছে স্বামীর সাথে। কিন্তু জোসেফ ওকে ছাড়ছে না। 'জোসেফ, বাচ্চাটার কথাও তোমাকে ভাবতে হবে। এমন জঘন্য পরিবেশে ওকে আমরা মানুষ করব কিভাবে!'

জোসেফকে এক মুহূর্তের জন্য সিরিয়াস দেখাল। 'সবই আমি বুঝি, কারিশমা। কিন্তু এখান থেকে যেতে হলে অনেক টাকার দরকার। একদিন ঠিকই টাকা হবে আমাদের···।'

'একদিন! একদিন! সব সময় তুমি একদিনের কথা বলো। এই একদিন ইহজীবনে আর আসবে না।'

'আসবে আসবে, এখন তুমি আমাকে চুমুটা খেতে দাও তো।'

'এত চুমু খাও তারপরও সাধ মেটে না, না?' মুচকি হেসে বলল মারিয়া। এখনও ধস্তাধস্তি করছে, তবে আগের মত জোরাল নয়। 'কিছু লোক কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। তা বাপু, তোমার পুত্রধনের কথা ভাব কিছু?'

'পেড্রো ঠিকই আছে। ছেলের মাথা তার বাপের মতই সাফ। আর দেখতেও হ্যান্ডসাম হয়ে উঠছে দিনদিন। ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে ওর পিছু নেবে, দেখো।'

'ঠিক আছে, নিক। কিন্তু তারা যেন শহুরে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বভাবের মেয়ে হয়। এখানকার মেয়েদের মত গাঁইয়া যেন না হয়।'

'হবে হবে। ঈশ্বরের দিব্যি, আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। এবার আমাকে একটা চুমু দাও।'

মারিয়া আর আপত্তি করল না। স্বামীর ঘাড় জড়িয়ে ধরল মৃণাল বাহু দিয়ে। প্রগাঢ় চুম্বন করল। 'তোমার সাথে আমার বিয়ের কত বছর চলছে খেয়াল আছে! বুড়ি হতে চলেছি, অথচ আমার কি ভাগ্যি এখনও তুমি আমাকে আগের মতই ভালবাস।'

জোসেফ মারিয়ার নাকে নাক ঘষতে ঘষতে বলল, 'বুড়ি না ছাই! তোমার মত সুন্দরী এ তল্লাটে আর আছে কেউ? অবশ্য শহরে গেলে আলাদা কথা। সেখানে কি না অনেক সুন্দরীর ভিড়...'

'তোমার কি ধারণা আমি প্রতিযোগিতায় ভয় পাই?' কথাটা বলেই মারিয়া ঝাঁকি দিয়ে স্বামীর আলিঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আগন্তুককে দেখতে পেয়েছে। প্রচণ্ড গরমে ঘামে ভেজা মুখখানা চকচক করছে। হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করছে লোকটা।

মারিয়া লজ্জিত ভঙ্গিতে নড্ করল। 'গুড ডে, সিনর। আপনাকে লক্ষ করিনি। মাফ করবেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলে উঠল লোকটি। 'ক্ষমা প্রার্থনার কিছু নেই। লোকজন বলল রাত কাটাবার মত একটা জায়গা এখানে পাওয়া যাবে। তাই আসা। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি কি না।'

লোকটি মধ্যবয়স্ক। দেখে মনে হচ্ছে ব্যবসা-ট্যবসা করে। নিজের নাম বলল হার্টম্যান।

'আমাদের ভাল রুমগুলো যে ভাড়া হয়ে গেছে, সিনর।' বলল মারিয়া। 'তবে অন্য আরেকটা রুম এখনও খালি আছে।'

'যে-কোন একটা রুম হলেই চলবে। গা-টা একটু বিছানায় ফেলতে পারলেই হলো।'

অতিথির ঘর গোছানোর জন্যে উঠে এল মারিয়া। এই ঘরটা ওরা এর আগে কখনও ব্যবহার করেনি। প্রয়োজন পড়েনি তাই। চিলেকোঠার ঘরের ঠিক নিচেরটা এটা। নদীর তীরে বেড়ে ওঠা গাছগুলোর ঝাঁকড়া ডালপালা এঘরের বাইরেটা প্রায় ঢেকে রেখেছে।

ল্যান্ডিঙে আসতেই পেড্রোর সাথে মারিয়ার প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল। পেড্রো বুকের কাছে একটা টিনের পাত্র চেপে ধরে আছে।

'অঃ, তুই তাহলে এখানে, পেড্রো,' মারিয়া অবাক হয়ে বলল। 'অথচ তোকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা তুই আবার চিলেকোঠায় যাসনি তো? জায়গাটা ভাল না, তোকে বলাই আছে।'

পেড্রো কথা বলল না। বড় বড় চোখ, নিষ্পাপ দৃষ্টিতে তাকাল মায়ের দিকে। মারিয়া জবাবের প্রত্যাশা না করেই সটান ওপরে উঠে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পেড্রো। ভাগ্যিস মা জানতে চায়নি এতক্ষণ কোথায় কি করছিলাম। মা যদি আসল ব্যাপারটা কখনও জানতে পারে, নির্ঘাত বাবাকে বলে দেবে। আর বাবা একমুহূর্ত দেরি না করে ওর বন্ধুকে মেরে ফেলবে। বড়রা আসলে মাকড়সা ভাইদের পছন্দ

করে না, ভেবে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল পেড্রো।

ঘরে ঢুকতেই ভ্যাপসা গন্ধটা মারিয়ার নাকে এসে ধাক্কা মারল। অসহ্য এই গন্ধটার হাত থেকে কবে যে রক্ষা পাওয়া যাবে কে জানে। গন্ধটা যেন লেপটে আছে ঘরটার গায়ে, কোনদিন মুছবে না। ঝট্‌পট্‌ জানালাগুলো খুলে দিল মারিয়া। জানালা খোলার শব্দে গাছের ডালে বসে ঝাঁকা কাকাতুয়া আর লম্বা লেজের টিয়েগুলোর কোন ভাবান্তর হলো না। মাছি আর মশার ঝাঁক গুন্‌গুন্‌ করে উড়ছে। মাটি থেকে যেন তীব্র একটা উত্তাপ উঠে আসছে। মারিয়ার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তবু সান্ত্বনা এইটুকুই যে এই এলাকায় আর যে-সব ঘরবাড়ি আছে সেগুলোর তুলনায় ওদের এই রুমটা খারাপ নয়। অন্তত বিছানাটা তো পরিষ্কার, বাইরের পরিবেশ যাই হোক না কেন। মারিয়া ঘরটা গোছগাছ করতে শুরু করল।

সেই রাতে প্রচণ্ড গরমে, তীব্র অন্ধকারের মধ্যে ঘেমে একাকার হয়ে ঘুমাচ্ছিল হার্টম্যান। হঠাৎ এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠে জেগে গেল সে।

হার্টম্যান টের পেল কুৎসিত, রোমশ কতগুলো পা নিয়ে কি একটা জিনিস ওর নগ্ন বুকের ওপর নড়ছে। সেই ঘিনঘিনে স্পর্শে শিউরে উঠে হাত দিয়ে ঝাপটা মারল সে ওটাকে। সাথে সাথে তীব্র এক দংশন অনুভব করল বুকে। জিনিসটা ছিটকে পড়েছে কোথাও। অস্পষ্ট, হিসহিসে একটা শব্দ শুনতে পেল হার্টম্যান। আতঙ্ক, ভয় আর যন্ত্রণায় কাঠ হয়ে গেল সে। বুঝতে পারছে না ওটা কোথায় বসে শব্দ করছে। হঠাৎ টের পেল, ওর শরীর দ্রুত অবশ হয়ে আসছে। গোঙাতে গোঙাতে বিছানা থেকে নামতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই সংজ্ঞা হারাল।

পরদিন সকালে জোসেফ হার্টম্যানকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। সারা শরীর কালো হয়ে গেছে। দ্রুত হাতে দরজা বন্ধ করল মারিয়া, নেমে এল নিচে। 'হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর!' বুকে ক্রসচিহ্ন এঁকে ফিসফিস করল সে। 'লোকটার নিশ্চয়ই প্লেগ রোগ ছিল।'

'অনেক বছর এদিকে প্লেগ হয়েছে বলে শোনা যায়নি,' বলল জোসেফ। 'আমার একদম ভাল লাগছে না, মারিয়া। এ-ধরনের ঘটনা ব্যবসার জন্য খুব ক্ষতিকর।'

মারিয়া সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। কেউ জানে না এর ফল কি বয়ে আনবে।

লাল ট্রাউজার পরা ব্রাজিলিয়ান পুলিস এসে লাশ নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল জোসেফের দিকে। সেই চাউনিতে সন্দেহ। সেলুনে যেসব খরিদ্দার এল তারা আরও অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'ব্যবসাপাতি কেমন চলছে, জোসেফ? ভাল?' কেউ কেউ জানতে চাইল।

'এভাবে ঘরের অতিথি মরলে ব্যবসা কি আর ভাল চলবে, ভাই।' জোসেফ হাসার চেষ্টা করল।

'আমার ধারণা লোকটাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হয়েছে,' খরিদ্দার গম্ভীর সুরে বলল।

'কি জানি! কিন্তু আমি তো আর ওকে বিষ দিতে যাইনি,' স্পষ্ট বিরক্তি

জোসেফের কণ্ঠে। খরিদ্দার আর কোন কথা বলল না। মদের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে আগের মত সন্দেহের দৃষ্টিতে ওর দিকে বারবার তাকাতে লাগল।

পেড্রোকে রান্নাঘরে আটকে রাখা হয়েছে। খুব অধৈর্য হয়ে উঠেছে সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ঘনঘন পা বদল করছে। আশঙ্কিত হয়ে ভাবছে এখনও ওর মাকড়সা ভাইয়ের জন্য নাস্তা নিয়ে যাওয়া হলো না। বেচারা নিশ্চয়ই খিদেয় কাতর হয়ে আছে। বারবার সে টিনের পাত্রটার দিকে তাকাচ্ছে। নিশ্চিন্ত হতে চাইছে পিঁপড়েগুলো যথাস্থানে আছে কি না।

পেড্রোর মা স্টোরে কাজ করছিল এতক্ষণ। পুলিসগুলো চলে যেতে স্বামীর সাথে কথা বলতে চলে এল সে। আর এই সুযোগটাই পেড্রো এতক্ষণ খুঁজছিল। মায়ের লম্বা স্কার্টের আড়ালে আড়ালে দরজা পর্যন্ত এল সে। বাবার সাথে কথা বলতে ব্যস্ত মা, এই সময় পালাল ও। মা টেরই পেল না তার পুত্ররত্নটি দরজার ফাঁক দিয়ে গলে সোজা ওপরে ছুট লাগিয়েছে।

খুব সাবধানে ওপরে উঠে এল পেড্রো। মাকড়সা ভাই তার ওপর নিশ্চয়ই রেগে বোম হয়ে আছে, পুরানো দরজাটা খুলতে খুলতে ভাবল সে।

দোরগোড়ায় মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে রইল পেড্রো, আলোতে চোখ সইয়ে নিচ্ছে। অবাক হলো ভেবে, ওর সাড়া পাওয়া সত্ত্বেও এখনও মাকড়সা ভাই আসছে না কেন। নাকি এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে?

ভেতরে ঢুকল পেড্রো। আস্তে করে ডাকল, 'মাকড়সা ভাই, মাকড়সা ভাই, আমি এসে পড়েছি। দেরি হওয়ায় দুঃখিত।'

রুমের এক কোণে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা নির্জীব পড়ে আছে। নড়াচড়া করছে না দেখে ভয় হলো পেড্রোর। মারা যায়নি তো? একটু জোরে ডাকল সে, 'ও ভাই মাকড়সা। দেখো না, তোমার জন্য আমি নাস্তা নিয়ে এসেছি।'

নড়ে উঠল মাকড়সা। কালো, খাড়া কাঠের টুকরোটা থেকে নেমে এল দ্রুত। পেড্রো ওর দিকে এক কদম এগোতেই ঘুরে দাঁড়াল প্রাণীটা, শরীরের পেছনের অংশ কুঁচকে বসে রইল মেঝেতে। ওর অমানবিক ভয়ঙ্কর চোখ দুটো অশুভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাচ্চা ছেলেটির দিকে। কাস্তের মত চোয়াল দুটো নড়ছে, হিসহিসে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

মাকড়সাটার ভয়াবহ মূর্তি পেড্রোকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করল না। বরং মাকড়সা ভাইয়ের জন্যে তার খুব মায়া হচ্ছে। বেচারি সেই কখন থেকে না খেয়ে আছে। রেগে গিয়ে অধৈর্য হয়ে সে যদি অমন হিসহিস করে রাগ প্রকাশ করে, তুমি নিশ্চয়ই সেজন্যে তাকে দোষ দিতে পারো না!

পেড্রো মাকড়সাটার আরও কাছে এগিয়ে এল। টিনের পাত্রটা খুলে ভেতরের খাবার বের করে রাখল ওটার সামনে।

'আমার দেরি হয়েছে বলে মাপ চাইছি, মাকড়সা ভাই,' অনুনয়ের সুরে বলল পেড্রো। 'কিন্তু কি করব বলো, একটা লোক মারা গেল দোতলার ওই রুমে। পুলিস এল। ওকে নিয়েও গেল।' বকবক করে চলেছে সে, যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে। কিন্তু মাকড়সার কৈফিয়ত শোনার সময় কোথায়। সামনে রসাল খাবার দেখে সে বিন্দুমাত্র

দেরি না করে হামলে পড়েছে। পেটুকের মত দ্রুত গিলছে। পেড্রো তার মাকড়সা ভাইয়ের খাওয়া দেখে খুব খুশি হলো।

'মা আমাকে আসতেই দিতে চায় না, বুঝলে!' ফিসফিস করে বলল সে। 'কিন্তু আমি ঠিক পালিয়ে এসেছি।'

খাওয়া শেষ হতে খালি টিনটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল পেড্রো। মাকড়সাটা গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর চোখ দুটো স্থির পেড্রোর দিকে। এখনও চোয়াল জোড়া নড়ছে।

'আমাকে এখন যেতে হবে,' বলল পেড্রো। 'মা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাই, মাকড়সা ভাই।'

আস্তে আস্তে নামতে লাগল পেড্রো। সতর্ক চোখে দেখছে মা আবার হঠাৎ করে এসে পড়ে কি না। এখানে সে কিছুতেই ধরা পড়তে চায় না। তাহলে ভণ্ডুল হয়ে যাবে সবকিছু।

ল্যান্ডিং পর্যন্ত নিরাপদেই এল পেড্রো। এখন যদি শুধু দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে ভেতরে ঢুকতে পারে, তাহলে আর কোন সমস্যা হবে না। ওখান থেকে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকবে। ব্যস, কেউ জানতেই পারবে না চিলেকোঠার ছাদে গিয়েছিল সে।

দরজায় হাত রাখল, ধাক্কা দিতে যাবে, এমন সময় কর্কশ একটা কণ্ঠ কানে যেতেই পাথরের মত জমে গেল পেড্রো।

'আমার কোন সন্দেহই নেই যে লোকটা বিষাক্ত কিছু খেয়ে মরেছে। এরকম কেস এর আগেও দেখেছি আমি। কালির মত কালো হয়ে গিয়েছিল শরীর।'

'কিন্তু আমরা যা খেয়েছি সেও তো তাই খেয়েছিল,' এটা মায়ের গলা, কিন্তু গলাটা কেমন জানি একটু অদ্ভুত, উত্তেজিত।

'আর তার জিনিস-পত্রও চুরি গেছে! গতকাল যখন সে এল, তার কাছে বেশ কিছু টাকা পয়সা ছিল। কিন্তু লোকটাকে কবর দেয়ার সময় সেই টাকার কোন হদিস আমরা পাইনি।'

'লোকটা যে অবস্থাতে ছিল, সেই অবস্থাতেই আমি দরজা বন্ধ করে চলে এসেছি, সার্জেন্ট,' বাবা কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠও কেমন জানি অন্য রকম লাগছে। 'পুলিসরা বেতন পায় খুব কম; ওরা যদি কিছু করেও থাকে, দোষ দেয়া যায় না।'

'আ-আমাদের আপনি সন্দেহ করছেন?' রেগে মেগে বলল সার্জেন্ট।

'আমাকে যতক্ষণ কেউ সন্দেহ করছে না আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে অভিযুক্ত করছি না।'

'আপনি নিজের চরকায় তেল দিন, জোসেফ মোরেল্লো। এখানে আর কারও জানতে বাকি নেই যে এ জায়গা থেকে সরে যাওয়ার জন্যে আপনি টাকা যোগাড়ের ধান্ধায় আছেন।'

পেড্রো নিথর দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। সার্জেন্ট বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না ভেতরে যেতে। এই লোকটাকে সে খুব ভয় পায়।

শব্দ পেল সার্জেন্ট চলে যাচ্ছে, একমুহূর্ত খুব নীরব হয়ে গেল চারদিক। তারপর

কানে ভেসে এল কান্নার শব্দ। মা কাঁদছে।

পেড্রো আস্তে করে খুলল দরজাটা। দেখল বাবার বাহুতে মাথা রেখে কাঁদছে মা, আর বাবা মায়ের কালো চুলে হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল পেড্রোর। এক দৌড়ে চলে গেল তাঁদের কাছে। ওর চোখে টলমল করছে জল। মায়ের স্কার্টের আড়ালে মুখ ডুবিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

কয়েক দিন পর হাফ-ইন্ডিয়ান এক ব্যবসায়ী লোক এল পেড্রোদের বাড়িতে রাত কাটাতে। সেই একই রুমে থাকার ব্যবস্থা হলো তার। এবং পরদিন সকালে দেখা গেল লোকটি মরে পড়ে আছে বিছানায়। সারা শরীর কালো হয়ে গেছে তারও। খবর পেয়ে পুলিস এল মৃতদেহটাকে নিয়ে যেতে। মারিয়া ওর স্বামীকে জড়িয়ে ধরে গুঙিয়ে উঠল। 'আমাদের এখন কি হবে? এ কোন অভিশাপ নেমে এসেছে আমাদের ওপর!'

জোসেফ আস্তে করে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। 'আমি ওই ঘরের প্রতিটি ইঞ্চি এখন তন্নতন্ন করে খুঁজব, নির্ঘাত কোন বিষাক্ত সাপ আছে ওখানে।' একটা লাঠি নিয়ে সে সবে রওনা হচ্ছে দোতলার দিকে, এমন সময় সশব্দে খুলে গেল দরজা। সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়, হোঁৎকামুখো লোকটা কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জোসেফের দিকে।

'জোসেফ মোরেল্লো, হত্যার অপরাধে আমি তোমাকে গ্রেফতার করছি।'

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ, কথা যোগাচ্ছে না মুখে। মারিয়া চিৎকার করে উঠল, 'না! না! আপনি ওকে গ্রেফতার করবেন না, ও কারও সামান্য ক্ষতিও করেনি। একটা সাপ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা সাপই ওই লোক দুটোকে মেরেছে।'

কর্কশ গলায় হেসে উঠল সার্জেন্ট। 'ঠিক আছে, ওটা তাহলে একটা সাপই ছিল।' জোসেফের হাত চেপে ধরল সে বজ্র মুষ্টিতে। 'এখন চলো আমার সঙ্গে।'

মারিয়া হাহাকার করে উঠল। ওর বুকফাটা আর্তনাদে যেন সংবিৎ ফিরে পেল জোসেফ, প্রতিবাদ করে উঠল, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমি নির্দোষ। আমি কেন আমার খদ্দেরদের খুন করতে যাব?'

'কেন? কারণ ওদের দু'জনের পকেটেই বেশ মালপানি ছিল। এবং দু'বারই গায়েব হয়ে গেছে টাকাগুলো। আর সেই সাথে এটাও আমাদের ভাল করে জানা আছে এখান থেকে পাততাড়ি গোটানোর জন্য তোমার অর্থকড়ির বেশ প্রয়োজন।'

'কিন্তু ওই টাকা তো মেরে দিয়েছে পুলিসের লোক। যখন ওরা লাশ নিতে এসেছে, তখন।'

হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল সার্জেন্ট। 'প্রমাণ করতে পারবে?'

'বিশ্বাস করুন, যীশুর কিরে, আমি নির্দোষ,' অনুনয় করে বলল জোসেফ।

'ওটা কর্নেলই ঠিক করবেন।'

'কর্নেল?'

'কর্নেল ব্রানজা, কমিশনার।'

জোসেফের মুখ সাদা হয়ে গেল নামটা শুনে। কর্নেল ব্রানজার কুখ্যাতি

সর্বজনবিদিত। তার কথাই আইন। ফাঁসিতে ঝোলানো এই লোকের প্রিয় একটি শখ।

জোসেফকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে আসা হলো কর্নেল ব্রানজার সামনে। কর্নেলের নিষ্ঠুর, অভিব্যক্তিহীন মুখ দেখেই জোসেফ বুঝল ওর কোন আশাই নেই। কোন যুক্তির ধার ধারবে না এই লোক।

ট্রায়ালটা হলো যেনতেন ভাবে। জোসেফ নিজের পক্ষে প্রমাণ হাজির করার কোন সুযোগই পেল না।

'তারপর,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ব্রানজা। 'আর কি বলার আছে তোমার?'

'আমি নির্দোষ, স্যার,' ফরিয়াদ জানাল জোসেফ। 'ঈশ্বরের দিব্যি, আমি নির্দোষ। যে লোকগুলোকে আমার বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে আমি সত্যিই তাদের খুন করিনি।'

'তাহলে কিভাবে ওরা মারা গেল, শুনি?'

'ওদের নিশ্চয় প্লেগ রোগ ছিল, স্যার।'

'কী—দু'জনেরই? চাপা মারার আর জায়গা পাও না, না? ওরা দু'জনে একই এলাকা থেকে আসেনি। এবং দু'জনকেই তোমার বাড়িতে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার। কাল সকাল আটটায় তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। সার্জেন্ট, ওকে নিয়ে যাও!' হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল ব্রানজা।

সার্জেন্ট নিষ্ঠুরভাবে ধাক্কা দিয়ে রুম থেকে বের করল জোসেফকে। প্যাচপেচে নোংরা কমপাউন্ড দিয়ে ওকে হিঁচড়ে টেনে এনে ছোট্ট, অপরিচ্ছন্ন লকআপে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিল বাইরে থেকে।

পেড্রোর মন খুব খারাপ। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও মা ওকে চোখের আড়াল হতে দিচ্ছে না। প্রিয় বন্ধুকে খাবার দিয়ে আসার জন্য পালানোর চেষ্টা বহুবার করেছে সে, কিন্তু পারেনি। একবার দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠেও গিয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে চড় খেয়েছে। চিৎকার করে কেঁদেছে ও। মা-ও কেঁদেছে সাথে সাথে। কাঁদতে কাঁদতে পেড্রো কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে বাবা যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে। তাহলে ওদের আর এভাবে কাঁদতে হবে না। মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠবে আবার। মা আর তখন তাকে এভাবে চোখে চোখে রাখবে না। প্রিয় বন্ধুর কাছে যেতে বেগ পেতেও হবে না।

পেড্রোর মনে ক্ষীণ আশা আজ রাতে কিংবা কাল সকালে হয়তো সে তার মাকড়সা ভাইয়ের কাছে যেতে পারবে। কারণ আজ হঠাৎ করেই ওর দাদা এসে হাজির দেশের বাড়ি থেকে। উনি এখন মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। রাতের বেলা যখন দু'জনই ঘুমিয়ে পড়বে তখন…।

'ওই ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি কিছু পাইনি,' বুড়ো মোরেল্লো বললেন মারিয়াকে। 'এখন আমি কি করতে যাচ্ছি, জানো? ঠিক করেছি আজ রাতটা নিজেই ওখানে কাটাব।'

'না, বাবা—' শিউরে উঠল মারিয়া।

'আমার ছেলেকে রক্ষার এটাই এখন একমাত্র উপায়, মা।'

'কিন্তু আপনার যদি কোন বিপদ হয়?'

'মানে যদি মারা যাই? তাহলে আমার মরণ বৃথা যাবে না,' দৃঢ় গলায় বললেন মোরেল্লো। 'ওই কমিশনার ব্যাটা জানবে আমার মৃত্যুর জন্য আমার পুত্র দায়ী নয়। সুতরাং সে প্রথম দু'জনের মৃত্যুর জন্যেও তাকে আর দায়ী করতে পারবে না।'

'না না, বাবা! আমি জেনেশুনে আপনাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না!' কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল মারিয়া।

'না, মারিয়া, আজ রাতে ওই ঘরে আমাকে ঘুমাতেই হবে। জোসেফকে নিরপরাধ প্রমাণ করার এটাই একমাত্র পথ।'

মারিয়ার চোখে অশ্রুর ঢল নেমেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে মুখ রাখল শ্বশুরের কাঁধে।

'অনেকদিন তো বাঁচলাম রে, মা,' 'পুত্রবধূর পিঠে হাত রেখে বললেন বৃদ্ধ। 'তোমরা তো সবে জীবনটা শুরু করেছ।'

মাকড়সা ভাইয়ের চিন্তায় ঘুমই আসছে না পেড্রোর।

তার মাকড়সা ভাইয়ের ভীষণ খিদে পেয়েছে, এই ভাবনাটা বনবন করে ঘুরছে মাথার মধ্যে। যদি এমন হয়, কাল সকালেও সে খাবার দিয়ে আসতে পারল না তাহলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ দাদাও এখন ওকে খুব চোখে চোখে রাখছেন। মা তাঁকে নালিশ করেছে পেড্রো নাকি প্রায়ই দোতলায় যায়। আর জায়গাটা ওর জন্য মোটেও নিরাপদ নয়।

পেড্রো এপাশ ওপাশ করছে বারবার। স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় ঘরের মধ্যে সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মা ঘরের ওধারে তাঁর বিছানায় শুয়ে। নিশ্চয়ই এখনও ঘুমায়নি। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। মা না ঘুমানো পর্যন্ত এখান থেকে পালাবার কোন পথই নেই। মা ঘুমিয়ে পড়লেই সুযোগটা কাজে লাগাবে পেড্রো। তার মাকড়সা ভাইয়ের জন্য খাবারদাবার রেডী করেই রাখা আছে বিছানার নিচে। পেড্রো কল্পনায় দেখতে পেল হামাগুড়ি দিয়ে সে এই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এখন পা টিপে টিপে পার হচ্ছে দাদার ঘর, আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওপরে, খুব সাবধানে পা ফেলে সে এবার উঠে এসেছে আসল জায়গায়। এখানে তার প্রিয়বন্ধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে খাবারের জন্যে।

পেড্রো কোন শব্দ না করে উঠে বসল বিছানায়। মা ওদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার জানার কথা নয় মা নিঃশব্দে কাঁদছে।

বিছানা থেকে বাইন মাছের মত পিছলে নেমে এল পেড্রো। খুবই সাবধানে ওর মহামূল্যবান টিনের পাত্রটা বের করল খাটের নিচ থেকে। ভূতের মত নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। কল্পনায় যেমনটি দেখেছিল সবকিছু ঠিক তেমনটি ঘটল। কিন্তু চিলেকোঠার নড়বড়ে দরজাটা খুলে ভেতরে চারদিকে চোখ বুলিয়েও কোথাও তার মাকড়সা ভাইকে দেখতে পেল না। অথচ উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দিনের

চেয়েও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করল পেড্রো। কিন্তু শ্রীমানের কোন খবরই নেই। সাবধানে পচা কাঠের মেঝেতে পা ফেলে সামনে এগোল সে, কোনায় বসে তার বন্ধু ঘুমোচ্ছে কিনা দেখতে। মেঝের একটা অংশ, যেখানে কাঠ খসে গিয়ে বড় একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আসতেই দেখল তাঁর দাদা যে রূমে ঘুমিয়ে আছেন, সেটার কড়িকাঠ বেয়ে মাকড়সাটা নেমে যাচ্ছে নিচে।

ঝুঁকল পেড্রো, আস্তে করে ডাকল। 'মাকড়সা ভাই, মাকড়সা ভাই, ফিরে এসো। তোমার রাতের খাবার নিয়ে এসেছি আমি!' কিন্তু মাকড়সা ওর কথা গ্রাহ্যই করল না। তির্যক ভঙ্গিতে কড়িকাঠ বেয়ে নেমে যেতে লাগল। এই কড়িকাঠটা বুড়ো মোরেল্লো যে বিছানায় শুয়ে আছেন তাঁর সাথে সংযুক্ত। কাঁকড়ার মত পা ফেলে সেদিকেই এগুচ্ছে কুৎসিত প্রাণীটা।

পেড্রো ভেবে পাচ্ছে না এখন কি করবে। অপেক্ষা করবে নাকি দাদার ঘরেই নিয়ে যাবে খাবার? কয়েক মুহূর্ত দোটানায় ভুগল সে। শেষমেষ দাদার ঘরেই যাবে ঠিক করল। কারণ এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে মা যদি ইতিমধ্যে জেগে উঠে তাকে বিছানায় দেখতে না পায় তাহলে মহা হুলুস্থূল বাঁধাবে।

সতর্কভঙ্গিতে নেমে এল পেড্রো নিচে। দাদার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে দরজার হাতল ঘোরাল। দেখবে ওর মাকড়সা ভাই এখনও এখানে আছে কি না। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। উঁকি মারল সে ভেতরে।

হ্যাঁ, আছে। মাকড়সা ভাই বিছানার ওপরেই বসে আছে। দাদা দিব্যি ঘুমাচ্ছেন। ভেতরে ঢুকল পেড্রো পা টিপে টিপে। টিন খুলল। নড়ে উঠল ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। এগোতে শুরু করেছে বুড়ো মোরেল্লোর নগ্ন বুকের দিকে। মরণ কামড় দিতে যাচ্ছে।

'মাকড়সা ভাই, দেরি হওয়ার জন্য আমার কোন দোষ নেই, বিশ্বাস করো,' ফিসফিস করে বলছে পেড্রো, যেন মান ভাঙাতে চাইছে। 'কিন্তু কাল আমি তোমাকে এরচেয়ে আরও বেশি খাবার এনে দেব, কেমন?' মাকড়সাটা পেড্রোর উপস্থিতিতে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল, থমকে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে দোরগোড়া থেকে তীক্ষ্ণ এক চিৎকার ভেসে এল। পেড্রো সাথে সাথে ঘুরে দেখে মা ওখানে দাঁড়িয়ে, মুখে হাত চাপা দেয়া, আতঙ্কিত চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে প্রকাণ্ড মাকড়সাটার ওপর।

মারিয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে মোরেল্লোর। চোখ খুলেই দেখলেন ভয়ঙ্কর রোমশ প্রাণীটা দৌড়ে আসছে তাঁর দিকে, কাস্তের মত বাঁকানো চোয়াল দুটো ক্রমাগত নড়ছে। বিদ্যুৎ খেলে গেল বৃদ্ধের শরীরে। এক ঝটকায় কম্বলটা তিনি ছুঁড়ে মারলেন শূন্যে।

মাকড়সাটা থপ করে ছিটকে পড়ে গেল মেঝেতে। পড়েই ছুটে গেল পেড্রোর দিকে। পেড্রো তখন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দাদার নগ্ন ভাস্কর্য দেখছে। মারিয়া টান মেরে ওকে সরিয়ে আনল। বিছানার পাশে রাখা ছুরিটা মোরেল্লো মাকড়সাটাকে লক্ষ্য করে সবেগে ছুঁড়ে মারলেন। মেঝের সাথে গেঁথে গেল ওটা, মৃত্যু যন্ত্রণায়

মোচড় খাচ্ছে দেহ। বিজবিজ করে বিষ বেরিয়ে এল ওটার মুখ থেকে। ভিজিয়ে দিল কাঠের মেঝে। মারিয়া আটকে রাখা শ্বাস ফেলল সশব্দে।

'এটা একটা অ্যাপাজাউকা মাকড়সা!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মোরেল্লো। 'এতবড় সাইজের মাকড়সা বহুবছর ধরে এদিকে দেখা যায়নি। এটা নিশ্চয়ই কয়েকশো মাইল দূরের পাহাড় থেকে এদিকে চলে এসেছে।'

পেড্রো যেই দেখল ওর মাকড়সা ভাই ছটফট করতে করতে অবশেষে মারা গেছে, গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়ে দিল সে। 'দাদা আমার মাকড়সা ভাইকে মেরে ফেলেছে,' কাঁদতে কাঁদতে বলল সে। 'আমি তো শুধু ওকে খেতে দিয়েছিলাম। ও তো কোন দোষ করেনি। ওমা, দাদা কেন আমার মাকড়সা ভাইকে মেরে ফেলল? অ্যাঁ-অ্যাঁ...'

মারিয়া স্তম্ভিত হয়ে তার ছেলের দিকে তাকাল, 'তুই ওকে খেতে দিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি তো। প্রতিদিনই দিতাম!'

শরীরে ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। শিউরে উঠে পেড্রোকে কোলে তুলে নিল মারিয়া। 'হে ঈশ্বর! কি শুনলাম আমি! চল্ বাবা চল, শিগ্গির এখান থেকে চল্!'

আমাদের পেড্রো খুব শিগ্গিরই তার মাকড়সা ভাইয়ের দুঃখ ভুলে গেল যখন ওর বাবা ছাড়া পেয়ে চলে এল বাড়িতে আর মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠল আবার। পেড্রো প্রতিজ্ঞা করল সে আর কক্ষনো ওই নড়বড়ে চিলেকোঠার ছাদে যাবে না। আর বাবা যেদিন বলল শিগ্গিরই তারা পেরনামবুকো নামে বড় একটা শহরে গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধবে, তখন পেড্রোর খুশি আর ধরে না। কারণ জীবনে এই প্রথম সে শহর দেখবে, তাই।

দুঃস্বপ্নের রাত

তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়েছ, ডেভিড।

হ্যাঁ, আমি এখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

আমি এখন তোমার স্ত্রীর সাথে কথা বলব। তুমি কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নাও, ডেভিড।

ঠিক আছে, ডাক্তার। আমি কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিচ্ছি। আপনি কথা বলুন।

মিসেস কার্পেন্টার, আপনার স্বামী এখন সম্মোহনের হালকা স্তরে আছেন। ওকে কোন রকম বিরক্ত না করেই আমরা এখন কথা বলতে পারব।

ঠিক আছে, ডাক্তার ম্যানসন। বুঝতে পেরেছি। আপনি কি জানতে চান, বলুন?

প্রথমেই আমি ডেভিডের দুঃস্বপ্নের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই। আপনি আমাকে বলেছেন আপনাদের বিয়ের রাত থেকেই নাকি ডেভিড এই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

জ্বী, ডাক্তার। ব্যাপারটার শুরু হপ্তাখানেক আগে। বিয়ের ঝামেলাটা চুকে যাবার পরপরই আমরা সরাসরি আমাদের এই নতুন বাড়িতে চলে আসি। কয়েকজন অতিথিকে দাওয়াত করেছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে চুকতে মাঝ রাত হয়ে যায়। তারপর আমরা ঘুমাতে যাই। ঠিক ভোরের দিকে আমার ঘুম ভেঙে যায় ডেভিডের চিৎকারে। ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড চিৎকার করছিল ও। শরীর মোচড় খাচ্ছিল, দুর্বোধ্য স্বরে কি যেন বলছিল। আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে জাগালাম ওকে। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ডেভিডের। রীতিমত কাঁপছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। শিউরে উঠল ও। বলল ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু স্বপ্নটা কি ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেনি, তাই না?

হ্যাঁ। কিছুই মনে করতে পারেনি। একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল ডেভিড। কিন্তু পরদিন রাতে একই ঘটনা। পরের দিন রাতেও। এভাবে প্রতিটি রাতে ও দুঃস্বপ্ন দেখছে।

মিসেস কার্পেন্টার, এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। ডেভিডকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। আমার বিশ্বাস ওকে এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্ত করতে আমাকে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

তাই যেন হয়, ডাক্তার।

সম্ভবত রিচার্ড ওর অবচেতন মনে আবার ঢুকে পড়েছে।

রিচার্ড? রিচার্ড কে, ডাক্তার?

রিচার্ড হচ্ছে ডেভিডের দ্বিতীয় সত্তা।

ঠিক বুঝলাম না। অনুগ্রহ করে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

তাহলে শুনুন ঘটনাটা। ডেভিডের বয়স তখন বছর বারো হবে, এই সময় ও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট। দুর্ঘটনায় প্রচণ্ড রকম শক্ পায় ডেভিড। মানসিক রোগীতে পরিণত হয় সে। আর তখনই তার ভেতর দুটো ব্যক্তিত্ব বা সত্তা গড়ে ওঠে। একটি সত্তার মালিক ডেভিড নিজেই। আর অন্য সত্তাটি ডেভিডের সম্পূর্ণ বিপরীত। বেপরোয়া, অশুভ এবং ভয়ঙ্কর। এই বিপরীত ধর্মী সত্তাটিকেই ডেভিড রিচার্ড বলে ভাবতে থাকে এবং তার মতে রিচার্ড তারই যমজ ভাই। বলাবাহুল্য, মিসেস কার্পেন্টার, ডেভিড তাঁর কল্পনায় এই দ্বিতীয় সত্তাকে মনে মনে পুষে এসেছে।

কি অদ্ভুত ব্যাপার!

অবাক হওয়ার কিছু নেই, মিসেস কার্পেন্টার। মেডিকেল হিস্টরিতে এরকম কেস বহু আছে। তো যা বলছিলাম। ডেভিড যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা ভয় পায় কিংবা উদ্বিগ্ন হয়, তখন ডেভিডের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ চলে আসে দ্বিতীয় সত্তা রিচার্ডের। তখন রিচার্ডই ডেভিডকে পরিচালনা করে। যেমন ডেভিড ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিছানার চাদরে। রিচার্ড যা বলে ডেভিড তখন তাই শোনে। কারণ নিজের ওপর তখন তার কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না। মাঝে মাঝে ডেভিড বুঝতেও পারে না সে কি করছে বা করতে যাচ্ছে। কখনও কখনও তার মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই আসলে একটা দুঃস্বপ্ন ছিল।

কি ভয়ঙ্কর!

ডেভিডের এই মানসিক রোগের চিকিৎসা আমিই করেছি। অবশ্য ভেবেছিলাম যে ডেভিডের মন থেকে রিচার্ডকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। কিন্তু এটা সম্ভব হত···যাকগে। আমি এখন ডেভিডকে জিজ্ঞেস করে ওর দুঃস্বপ্নের ব্যাপারটা জেনে নেই। ব্যাপারটা পুরো জানতে পারলে বোধহয় সম্ভব হবে সমাধানের একটা পথ খুঁজে বের করা।···ডেভিড!

বলুন, ডাক্তার?

যে দুঃস্বপ্ন তোমাকে বারবার বিরক্ত করছে সেই স্বপ্ন সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি আমি তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে চাইছি। তুমি কি স্বপ্নের কথা মনে করতে পারছ, নাকি পারছ না?

স্বপ্ন! হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বপ্নের কথা মনে পড়ছে আমার। আমি মনে করতে পারছি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, এত উত্তেজিত হতে হবে না। শান্ত হও। ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে স্বপ্নের কথা খুলে বলো। প্রথম কবে তুমি এই স্বপ্নটা দেখেছ?

প্রথমবার—ও হ্যাঁ, অ্যানকে যেদিন বিয়ে করলাম সেই রাতে আমি স্বপ্নটা প্রথম দেখি। না না, ভুল বলেছি। ওইদিন না। বিয়ের আগের রাতে আমি আসলে স্বপ্নটা দেখি।

ঠিক বলছ তো?

হ্যাঁ। ওইদিন সন্ধ্যায় রিভারডেপের কাছে কেনা নতুন বাড়িতে আমি আসি সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে। নতুন বাড়িতে অ্যানের যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয় তা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সবকিছু দেখেশুনে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে যায়। সেদিন আমি খুবই ক্লান্ত ছিলাম।

বিছানায় গেলাম। তবে এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম এল না। ঘুমের বড়ি খেলাম। কিন্তু গভীর ঘুম আসার আগেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটার শুরু হলো।

কিভাবে শুরু হলো, ডেভিড?

মনে হলো স্বপ্নের মধ্যে বুঝি টেলিফোন বাজছে। আমার বিছানার পাশেই টেবিলের ওপর ফোনটা সবসময় থাকে। স্বপ্নের মধ্যে আমি উঠে বসলাম। ফোনও ধরলাম। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ব্যাপারটা আসলে স্বপ্ন নয়, সত্যি। পরক্ষণে বুঝলাম, না, আমি সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখছি।

কিভাবে বুঝলে, ডেভিড?

কারণ লুইজি তখন ফোনে কথা বলছিল। ঘুমের মধ্যে আমার এটুকু চেতনা ছিল যে লুইজি কিছুতেই কথা বলতে পারে না। ও তো মারা গেছে।

লুইজি কবে মারা গেছে, ডেভিড?

এক বছর আগে। ও তখন পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় যাচ্ছিল ওর বাবা মা'র সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তায় ওর গাড়িটা উল্টে গিয়ে খাদে পড়ে। আগুনে পুড়ে মারা যায় লুইজি।

তারমানে দেখা যাচ্ছে তুমি যখন ফোনে ওর কথা শুনলে তখন তুমি ভাবছ আসলে তুমি স্বপ্ন দেখছ, তাই না?

অবশ্যই। লুইজি বলছিল, 'ডেভিড, আমি লুইজি বলছি···ডেভিড, কি হয়েছে? কথা বলছ না কেন?' এক মুহূর্তের জন্যে আমার মুখে কোন জবাব যোগাল না। তারপর স্বপ্নের মধ্যে বললাম, 'তুমি লুইজি হতে পারো না। লুইজি মারা গেছে।'

'তাই কি, ডেভিড?' লুইজির তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠ ভেসে এল ইথারে। এই কণ্ঠ আমার খুব পরিচিত। ও আবার বলল, 'সত্যি কি লুইজি মারা গেছে?'

'এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়,' আমি ওকে বললাম। 'আমি এখুনি ঘুম থেকে জেগে উঠব। দেখব এতক্ষণ আমি একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'ঠিক কথা, ডার্লিং,' লুইজি হাসল। 'তোমার এখন ঘুম থেকে উঠে পড়াই উচিত। কারণ আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলব। আমিও কবর থেকে উঠে আসছি।'

ফোন রেখে দিল লুইজি। হঠাৎ করেই স্বপ্নটা বদলে গেল। যেভাবে ঘুমের মধ্যে হুট হাট করে স্বপ্নেরা বদলে যায়, তেমনি। দেখি আমি পুরো পোশাক আশাক পরে আছি। বসে বসে সিগারেট ফুঁকছি। অপেক্ষা করছি আসলে। অপেক্ষা করছি লুইজির জন্যে। লুইজি বলেছে ও কবর থেকে উঠে আসছে আমার সাথে কথা বলার জন্যে।

দ্বিতীয় সিগারেটটা শেষ করেছি সবে, এই সময় বেজে উঠল কলিংবেল। যান্ত্রিক মানুষের মত উঠে দাঁড়ালাম আমি। সোজা গিয়ে দরজা খুললাম। না, লুইজি নয়। রিচার্ড। দাঁড়িয়ে আছে দরজার ওপাশে।

তোমার জমজ ভাই, রিচার্ড।

জ্বী, আমার জমজ ভাই। তবে আমার চেয়ে লম্বা, শক্তিশালী। আর দেখতেও অনেক হ্যান্ডসাম। ও আমাকে দেখে হাসল। চোখে সেই পুরানো বুনো ভাব। চকচক করছে।

'হ্যালো, ডেভিড,' বলল সে। 'আমাকে ভেতরে আসতে বলবে না? হাজার হোক পনেরো বছর ধরে তোমার সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই। ভদ্রতার খাতিরেও তো একবার আমাকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত, নাকি?'

'না, রিচার্ড।' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'তুমি আবার ফিরে আসতে পারো না!'

'কিন্তু আমি ফিরে এসেছি,' বলে আমাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও। 'অনেকদিন ধরেই আমি মনে মনে প্ল্যান করছিলাম কোন ছুতোয় তোমার কাছে আসা যায়। আজ রাতে অবশ্য এখানে আসার বেশ ভাল একটা কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।'

'তুমি আবার এলে কেন?' আমি জানতে চাইলাম। 'তুমি তো মরেই গেছ। আমি আর ডাক্তার ম্যানসন মিলে তোমাকে খুন করেছি।'

'লুইজিও তো মরে গেছে,' বলল রিচার্ড। 'সে যদি আজ রাতে আসতে পারে আমার আসতে দোষ কি?'

'তুমি আসলে কি চাও বলো তো?'

'শুধু তোমাকে সাহায্য করতে চাই, ডেভিড। আজ রাতে তোমার সাহায্যের খুবই দরকার। মৃতা স্ত্রীর সাথে নতুন করে সাক্ষাৎ করার মত স্নায়ুর জোর তোমার নেই যে!'

'প্লীজ, রিচার্ড, প্লীজ। দয়া করে চলে যাও!' রীতিমত অনুনয় করে বললাম আমি।

আমার কথার জবাব দিল না রিচার্ড। বলল, 'দরজায় কে যেন ঘা মারছে। এ লুইজি না হয়েই যায় না। তুমি ওর সাথে কথা বলো। তবে মনে রেখো কাছেপিঠেই আছি আমি। সাহায্যের দরকার হলে ডাক দিয়ো।'

রিচার্ড চলে গেল পাশের রুমে। দরজায় অসহিষ্ণু ঘা বেড়েই চলছে। দরজা খুলে দিলাম। লুইজি। সাদা পোশাক পরনে। যেভাবে আমি কবর দিয়েছিলাম ঠিক সেই পোশাক। মাথায় ঘোমটা। বীভৎস পোড়া মুখটা ঢেকে রেখেছে। আমাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল লুইজি। খুব আস্তে একটা চেয়ারে বসল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর কথা বলে উঠল লুইজি, 'আমাকে দেখে খুব চমকে উঠেছ, তাই না, ডেভিড? যাও দরজাটা বন্ধ করে এসো। তারপর তোমার সাথে কথা বলছি।'

আমি দরজা বন্ধ করলাম। তারপর বিস্ফোরণের মত আমার গলা থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল। 'কি চাও তুমি এখানে? বলো, কেন এসেছ তুমি? তুমি তো মারা গেছ।' হাসিতে ভেঙে পড়ল সে। হাসতে হাসতে বলল, 'তাই নাকি, ডেভিড? আমি মারা গেছি? তুমি নিশ্চই বিশ্বাস করো না যে আমি মারা গেছি, নাকি করো? না, ডেভিড, আমি মরিনি। তোমার সাথে একটা ছোট্ট মজা করেছি।'

'মজা? আমার সাথে?' আমি হতবুদ্ধির মত বললাম। আবার হাসতে শুরু করল লুইজি। এমন হাসি, যেন মৃগী রোগ হয়েছে।

'হ্যাঁ, ডেভিড,' ভর্ৎসনা করে বলল সে। 'যে-কোন সমস্যা এলেই তুমি ভয়ে অস্থির হয়ে যাও। তাই আমার ভূত সেজে দেখতে ইচ্ছে করল তুমি আসলে কি

করো।'

'মিথ্যে কথা বলছ তুমি,' আমি চিৎকার করে বললাম। 'তুমি মৃত। আমি নিজে তোমাকে কবর দিতে দেখেছি।'

'মেরীর কসম, ডেভিড। আমি মিথ্যে বলছি না।' এবার লুইজিকে একটু বিরক্তই মনে হলো। 'আমার দিকে ভাল করে তাকাও তো। আমাকে কি মরা মানুষের মত লাগছে দেখতে?'

ঘোমটা উঠিয়ে ফেলল লুইজি। ওর মুখ দেখতে পেলাম আমি। সারা মুখে কোথাও একটা দাগ নেই। ভরাট গাল, উজ্জ্বল চোখ, ঝকমকে দাঁত। টসটসে অধরে বেড়াল সুলভ হাসি। 'তুমি যাকে কবর দিয়েছ সে আমি না। অন্য একটি মেয়ে। মেয়েটিকে আমি রাস্তা থেকে তুলে নিয়েছিলাম। আমার কাছে লিফট চেয়েছিল। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় মেয়েটি। অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাই আমি। ওর আঙুলে আমার আংটি পরিয়ে দেই। আমার হাত ব্যাগটা রেখে দেই ওর শরীরের নিচে। তারপর গাড়িতে আগুন লাগাই।'

'কিন্তু কেন?' গুঙিয়ে উঠলাম আমি। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। 'এই কাজ কেন করতে গেলে তুমি?'

'কারণ আমি মজা দেখতে চেয়েছিলাম। আমাকে নিয়ে তুমি যতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে আমি তার চেয়েও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তোমার সাথে বাস করতে গিয়ে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়ে বেঁচে থাকার প্ল্যানটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম যখন এই লুকোচুরি খেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়ব তখন আবার ফিরে আসব। এখন আমার টাকা পয়সা সব শেষ। তাই আমাকে আবার ফিরতে হয়েছে।'

'কিন্তু আমি কাল বিয়ে করতে যাচ্ছি। অ্যান নামের একটি মেয়েকে।'

'সে কথা আমি জানি। খবরের কাগজেই জেনেছি তোমাদের বিয়ের কথা। খবরটা পড়ার পর মনে হলো তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না এত চমৎকার সময়ে তোমাদের চারপাশে আমি ঘুরঘুর করে তোমার বারোটা বাজাই। না, ডেভিড, আমি তোমার বারোটা বাজাব না। আমি না হয় আরও কিছুদিন মরার ভূমিকায় অভিনয় করব। তুমি নির্ভয়ে তোমার সেরা মক্কেলের মেয়েকে বিয়ে করতে পারো। আমি বাগড়া দিতে আসব না। তবে হ্যাঁ, এর বিনিময়ে আমার টাকা চাই।'

'না! আমি তোমাকে টাকা দেব না। তুমি তো মরে গেছ।'

'কাল রাতের সংবাদপত্রগুলোর হেডলাইনে কি হবে তা এখনই আমি কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,' বলল লুইজি, 'প্রখ্যাত তরুণ আইনজীবীর মৃতা স্ত্রীর সমাধি ত্যাগ—মৃতা স্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিয়ে কি ভণ্ডুলের পথে?'

'না!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

'বেশি না, দশ হাজার ডলার হলেই চলবে আমার। চুপচাপ ডিভোর্স পাবে তুমি আমার কাছ থেকে। কাকপক্ষীটিও টের পাবে না। নির্ভাবনায় বিয়েটা করতে পারবে। দেখো, কোন ঝামেলাই হবে না।'

আমি কোন কথা বললাম না। মনের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভীষণ দুর্বল ঠেকছে শরীর। মাথাটা কাজ করছে না। নিজেকে নিস্তেজ লাগছে। লুইজি উঠে

দাঁড়াল।

'প্রস্তাবটা ভেবে দেখো। আমি নাকে পাউডার লাগাতে যাচ্ছি। পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম ভাবার। তারপর এসে তোমার কাছ থেকে একটা চেক আশা করছি আমি।'

লুইজি বেরিয়ে গেল রূম থেকে। হতাশা আর যন্ত্রণায় আমি মুখ ঢেকে বসে রইলাম। কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করলাম এখনই যেন জেগে উঠি ঘুম থেকে। যখন চোখ তুললাম, দেখি পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড, আমার জমজ ভাই।

'তুমি পুরো ব্যাপারটাই গুবলেট করে ফেলেছ, ডেভিড। ও তোমার পিলে চমকে দিয়েছে দেখছি,' বলল রিচার্ড।

'কিন্তু ও তো মারা গেছে!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি।'

'কোন্‌টা স্বপ্ন আর কোন্‌টা স্বপ্ন নয় এ কথা কে বলতে পারে? আমার পরামর্শ হচ্ছে, ওকে কোন সুযোগ দিয়ো না। একবার যদি টাকা দাও, ও কয়েকদিন পর আবার এসে নির্ঘাত টাকা চাইবে।'

'কিন্তু এ ছাড়া আমার করার তো কিছু নেই।' হতাশায় আমি গুঙিয়ে উঠলাম।

'অবশ্যই আছে। লুইজি একবার মরেছে। ওকে আবারও একবার মরতে হবে।'

'না! না! ওকে আমি মারতে পারব না।'

'তাহলে তো পুরো ব্যাপারটা সেই ছেলেবেলার মত আমাকেই সামলাতে হয়। আমার দিকে তাকাও, ডেভিড।'

'না!' প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ওর উজ্জ্বল সম্মোহনী চোখের দিকে না চাইতে।

'আমার চোখের দিকে তাকাও, ডেভিড!'

'না! না!'

কিন্তু পারলাম না। চুম্বকের মত আকর্ষণ করল রিচার্ডের চোখ। সেই ছোটবেলার অনুভূতি ফিরে এল আমার মধ্যে। রিচার্ডের চোখ যেন ক্রমশ বড় হতে শুরু করেছে। কালো, অন্ধকার সেই চোখের তারা কি তীব্র আকর্ষণে আমাকে গ্রাস করে চলেছে টের পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে চোখ নয়, কালো জলের গভীর একটা হ্রদ। সেই হ্রদে আমি ডুবে যাচ্ছি···ডুবে যাচ্ছি।

'এখন, ডেভিড, তোমার শরীরের পুরো নিয়ন্ত্রণ আমি নিয়ে নিচ্ছি, যেভাবে আগে নিতাম। কিছুক্ষণের জন্যে তোমার সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে আমার মধ্যে।'

রিচার্ডের চোখের ওই সর্বগ্রাসী কালো দীঘি আমাকে দ্রুত গ্রাস করে চলল। হঠাৎ মাথাটা মোচড় দিয়ে উঠল। তারপরই দেখি রিচার্ড নেই। বুঝতে পারলাম। বরাবরের মত ওরই জিত হয়েছে। ও এখন আমাদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করছে। ওর কাছে আমি এখন সম্পূর্ণ অসহায়। এই চোখ এবং কান এখন শুধু আমার নয়, আমাদের। রিচার্ড যা বলবে কোন প্রতিবাদ ছাড়াই সেই কাজগুলো আমাকে করতে হবে।

লুইজি এই সময় রূমে ঢুকল। ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো আত্মবিশ্বাসে ঝকমক

করছে।

'তাহলে ডেভিড,' বলল সে, 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি মনস্থির করে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ, লুইজি, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।' আমার ভেতর থেকে কথা বলে উঠল রিচার্ড। তবে কণ্ঠ অনেক ভারি, গম্ভীর এবং আত্মবিশ্বাসী। লুইজি একটু চমকে উঠল।

বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন করে বলল, 'তাহলে চেকটা দাও। লাস ভেগাসে আমি ডিভোর্সের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলব। তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্কই থাকবে না।'

'তুমি কোন চেকও পাচ্ছ না, কোন ডিভোর্সও হচ্ছে না,' রিচার্ড বলল ওকে।

'তাহলে তো আঙুলটা বাঁকা করতেই হয়। তবে এই পাবলিসিটি কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারের জন্যে খুব একটা সুফল বয়ে আনবে না বলেই আমার বিশ্বাস, ডেভিড।'

'তুমি কোন পাবলিসিটিও করতে পারবে না। আর তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি, আমি ডেভিড নই। আমি রিচার্ড।'

'রিচার্ড?' বিস্মিত দেখাল লুইজিকে। 'কি আবোলতাবোল বকছ তুমি?'

'আবোলতাবোল না। আমি ডেভিডের জমজ ভাই। ডেভিড যা করতে পারে না, আমি রিচার্ড ওর সেই কাজগুলো করে দেই।'

'তোমার মাথাটা দেখছি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। যাকগে, আমি এখন যাচ্ছি। কাল সকাল ন'টা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে মন পরিবর্তন করে চেকটা আমাকে হস্তান্তর করতে হবে।'

'কোন চেক পাবে না তুমি। আমি খুব ভাল করেই জানি তুমি একটা দু'মুখো সাপ। আর দু'মুখো সাপেরা কখনও তাদের কথা রাখে না।'

বলতে বলতে রিচার্ড এগিয়ে এল ওর দিকে। এই প্রথম ভয় পেল লুইজি। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল, যেন দৌড় দেবে। খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরল রিচার্ড। টান মেরে ওকে নিজের দিকে ঘোরাল। তারপর কঠিন দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরল লুইজির গলা।

আমি অসহায়ের মত তাকিয়ে দেখলাম রিচার্ডের দুই হাত শক্ত হয়ে চেপে বসছে লুইজির গলায়। লুইজির মুখের রঙ দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করল। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। ত্রিশ সেকেন্ডের মত ধস্তাধস্তি করল ও। লাথি মারতে চাইল, খামচি বসাল। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল ওর প্রতিরোধ। জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে লুইজি। নীল হয়ে গেছে মুখ। হাঁ করা মুখের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালা। চোখ দুটো গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রিচার্ড ঠাণ্ডা মাথায় গলায় চাপ বাড়িয়েই চলল। এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল লুইজি। মারা গেছে ও। ছেড়ে দিল ওকে রিচার্ড। মেঝেতে পড়ে গেল নিষ্প্রাণ দেহটা।

'ঠিক আছে, ডেভিড,' বলল রিচার্ড, 'এখন তুমি কথা বলতে পারো।'

'তুমি...তুমি ওকে খুন করেছ!'

রিচার্ড আমার রুমাল দিয়ে ওর মুখ মুছল।

‘চমৎকার কথা। আমিই কি ওকে খুন করেছি, নাকি করিনি? সত্যি কি ও জীবিত ছিল নাকি মৃত ছিল?’

‘তুমি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছ। অবশ্যই ও মৃত ছিল। এটা নিছক একটা স্বপ্ন। কিন্তু—’

‘কিন্তু এটা স্বপ্ন হলেও তোমার বাড়িতে এরকম একটা লাশ এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না, তাই না? ওর আসল জায়গা যেখানে সেখানেই ওকে আমাদের রেখে আসা উচিত। ফেয়ারফিল্ড গোরস্থান।’

‘এটা কখনই সম্ভব নয়।’

‘তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব। আমি লুইজিকে নিয়ে লিফটে করে নেমে যাব নিচে, একটা ট্যাক্সি ডাকব এবং ওটাতে করেই ওকে গোরস্থানে রেখে আসব। ব্যস, ঝামেলা শেষ। এখন তুমি চুপ করো। আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আর কথা বলতে পারবে না।’

ঠাণ্ডা মাথায় কাজ শুরু করল রিচার্ড। প্রথমেই আমার টুপি আর গ্লাভস পরে নিল। লুইজির পার্স থেকে ঘোমটাটা বের করল। আটকে দিল ওর টুপির সাথে। কোট ঠিকঠাক করল, অবিন্যস্ত চুলগুলো আঁচড়ে দিল আগের মত। এখন লুইজির চেহারায় ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন নেই। হাতে তুলে নিল লাশটা। যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে বহন করছে এইভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

বেল বাজাল রিচার্ড। লুইজিকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পর লিফট এল। দরজা খুলে দিল। জিমি, আমাদের নৈশ প্রহরী।

‘ছোট্ট একটা সমস্যা হয়ে গেছে, জিমি,’ বলতে বলতে ভেতরে পা রাখল রিচার্ড। লুইজিকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই সময় লুইজির কোল থেকে ওর পার্সটা পড়ে গেল। যেভাবে রিচার্ড আশা করেছিল, সেভাবে জিমি ঝুঁকল, তুলে নিল পার্স। ফিরিয়ে দিল রিচার্ডকে।

‘এই ভদ্রমহিলা—’ রিচার্ড খুব স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল, ‘এখানে আসার আগে থেকেই মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁকে শুধু একটা ককটেল খেতে দিয়েছি। ইনি ওটা খেয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এখন আমাকেই ওঁর বাসায় যেতে হচ্ছে ওঁকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তুমি কি কষ্ট করে আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবে?’

‘কেন পারব না, মি. কার্পেন্টার। অবশ্যই পারব,’ জিমি বিগলিত গলায় বলল।

ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল জিমি। রিচার্ড লুইজিকে নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ওর হাবভাব এমন যেন এই গভীর রাতে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একটা লাশকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ার মত স্বাভাবিক কাজ আর হয় না। ‘কোথায় যাবেন, স্যার?’

জানতে চাইল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

‘ফেয়ারফিল্ড গোরস্থান।’

‘ফেয়ারফিল্ড গোরস্থান? এত রাতে? আপনি আমার সাথে মশকরা করছেন না তো, স্যার?’

‘একেবারেই না।’ রিচার্ড ড্রাইভারের প্রশ্নে খুবই বিরক্ত হলো। ওর কথার যদি কেউ দাম না দিতে চায় ও এভাবেই বিরক্ত হয়। ‘এই ভদ্রমহিলা মারা গেছেন এবং

আমি তাকে কবর দিতে যাচ্ছি,' ভ্রূ কুঁচকে বলল ও।

'শুনুন, স্যার!' ঘুরল ড্রাইভার। রাগে গনগন করছে মুখ। 'এই রাত দুপুরে এসব ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আপনি সত্যি কোথায় যেতে চান বলুন, না হয় দয়া করে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ুন।'

রিচার্ড এক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দুঃখিত। তোমার সাথে আমি সত্যি ইয়ার্কি করছিলাম। যাকগে, আমাদের রিভারডেল নিয়ে চলো—নয়শো সাঁইত্রিশ ওয়েস্ট স্ট্রিট।'

'হ্যাঁ, এটা একটা ঠিকানা হতে পারে বটে!' বিড়বিড় করে বলল ড্রাইভার। স্টার্ট দিল ট্যাক্সিতে। নিউ ইয়র্কের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে আমরা ছুটে চললাম। রিচার্ড এখনও লুইজিকে ধরে আছে। যেন একটা বাচ্চা মেয়েকে আদর করছে। ড্রাইভারকে শুনিয়ে ও বলল, 'আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরো, সোনা!'

টাইমস স্কোয়ার পেরিয়ে গেলাম আমরা। উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল লুইজির মুখে। ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়াতে হলো। লোকজন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অলস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ আমাদের দিকে। মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। বিশ্বের ব্যস্ততম শহরের কেন্দ্রস্থল ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কারও মনে সামান্যতম সন্দেহও জাগছে না, ট্যাক্সিতে রিচার্ডের গায়ে হেলান দেয়া ঘোমটা পরা এই মহিলাটি একটু আগে খুন হয়েছে। আসলে একটা লাশ বহন করে চলেছে রিচার্ড।

হেনরি হাডসন হাইওয়েতে উঠে ট্যাক্সি ছুটল রিভারডেলের দিকে। যে বাড়ির ঠিকানা রিচার্ড ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিয়েছে ওটা আমারই বাড়ি। অ্যান আর আমার জন্যে বাড়িটা কিনেছি আমি। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামল। রিচার্ড সাবধানে লুইজিকে নামাল ট্যাক্সি থেকে। পকেট থেকে টাকা বের করল। ভাড়া দিল। চলে গেল ট্যাক্সি ড্রাইভার। অন্ধকার রাত। শূন্য রাস্তা। এমনকি একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কেউ দেখল না, কেউ জানল না একটা লাশ নিয়ে রিচার্ড এই বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছে। পকেট থেকে চাবি বের করল সে। দরজা খুলল। লুইজিকে নিয়ে ঢুকল ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল না রিচার্ড। লিভিংরুমে একটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলল লুইজিকে। বসল ওর বিপরীতে। সিগারেট ধরাল। 'ঠিক আছে, ডেভিড, এখন তুমি কথা বলতে পারো,' বলল সে।

'রিচার্ড,' আমি রাগে আগুন হয়ে বললাম, 'তুমি পাগল হলে নাকি? লুইজিকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে রেখে আসার বদলে এখানে নিয়ে এসে মোটেই বুদ্ধির পরিচয় দাওনি তুমি। এখন আমরা কি করব শুনি?'

'আমারই বা আর কি করার ছিল?' বিরক্ত হয়ে বলল রিচার্ড, নিজেই তো দেখলে ওই ব্যাটা ড্রাইভারটা গোরস্থানে যেতে চাইল না।'

এই সময় আমাদের ভয়ানক চমকে দিয়ে উঠে বসল লুইজি।

লুইজিকে ভয়ানক অসুস্থ লাগছে। হাত দিয়ে গলা ডলল ও কিছুক্ষণ। যখন কথা বলল, ব্যাঙের মত আওয়াজ বেরুল গলা থেকে। 'ডেভিড,' রেগে মেগে বলল ও। 'তুমি—তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে।'

রিচার্ড ওর চোখের দিকে তাকাল। অশুভ, ভয়ঙ্কর একটা দৃষ্টি ফুটে উঠল

চোখে। 'কাজটা দেখছি আমি ঠিক মত করতে পারিনি।' স্বগতোক্তির মত শোনাল কথাটা। যেন নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে সে।

'তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে,' আবার বলল লুইজি। যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না ও। 'এ জন্যে তোমাকে জেলে যেতে হবে। মেরীর কসম আমি সেই ব্যবস্থা করব।'

'সেই সুযোগ তুমি আর পাবে না,' উঠে দাঁড়াল রিচার্ড। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে এগুলো ওর দিকে। 'কাজটা আবার নতুন করে করতে হবে, এটুকুই যা বাড়তি পরিশ্রম হবে আমার।'

লুইজি কুঁকড়ে গেল। খুনে দৃষ্টিটা চিনতে পেরেছে ও। প্রচণ্ড ভয় পেল। 'না, খোদার দোহাই, না।' চিৎকার করে উঠল লুইজি। 'আমি দুঃখিত ডেভিড, আমি আসলে কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি। মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। আমি আর জীবনেও তোমার কাছে আসব না। বিশ্বাস করো, জীবনে আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। আ-আমাকে মেরো না, প্লীজ!'

'আমি রিচার্ড, ডেভিড নই,' খসখসে গলায় বলল রিচার্ড। 'তোমাকে খুন করা খুব কঠিন কাজ, তাই না, লুইজি? দুইবার মরেও তুমি মরোনি। কিন্তু আর না। এই শেষবার, এবার তোমাকে মরতেই হবে।'

'থামো, রিচার্ড!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'ওকে যেতে দাও। ও চলে যাক। ও আর কখনও—'

'তুমি লুইজির মত মেয়েদের চেনো না, ডেভিড।' রিচার্ড আমাকে অবজ্ঞা করে বলল, 'চিনলে আর এই কথা বলতে না। যাকগে, এই ব্যাপারটা এখন শুধু আমার আর লুইজির। তুমি শুধু শুধু আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করছ। তোমাকে আর বিরক্ত করতে দেব না। ঘুমাও ডেভিড। ঘুমাও···ঘুমাও···।'

টের পেলাম আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি। বিশাল অন্ধকারের একটা পর্দা আমাকে ঢেকে ফেলছে দ্রুত। ঠিক ছেলেবেলার মত। রিচার্ড আমার সত্তা গ্রাস করছে, গ্রাস করছে···

কিছুক্ষণ পর নিজেকে আমি আমার বিছানায় আবিষ্কার করলাম। ঘুমের পোশাক পরা। রিচার্ড দাঁড়িয়ে আছে রূমের মাঝখানে। হাসছে আমার দিকে চেয়ে। 'ঠিক আছে, ডেভিড। আর কোন সমস্যা নেই। তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি এখন যাচ্ছি।'

'লুইজি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'লুইজির কি করেছ তুমি?'

রিচার্ড হাই তুলল। 'লুইজির কথা ভুলে যাও। ও আর তোমাকে কোনদিন বিরক্ত করতে আসবে না। ওর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

'কি-কি করেছ তুমি ওর? জবাব দাও।'

রিচার্ড হাসল। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'গুডনাইট ডেভিড। আমি গেলাম। ও হ্যাঁ, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার কোন কারণে ভয় পেয়ো না। মনে কোরো এটা স্রেফ একটা স্বপ্নই ছিল, কেমন? চমৎকার মজার একটা স্বপ্ন, তাই না?'

চলে গেল রিচার্ড। এক মুহূর্ত পর আমি চোখ মেললাম। দেয়াল ঘড়ির শব্দ

ভেসে এল কানে। ন'টা বেজেছে। বুঝলাম এতক্ষণ আসলে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। তো এই আমার কাহিনী, ডাক্তার। এখন আপনার বক্তব্য কি?

ধন্যবাদ, ডেভিড। পুরো ব্যাপারটাই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। আমি জিনিসটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেই আর কখনও এই স্বপ্ন তুমি দেখবে না।

বলুন, ডাক্তার।

তোমার প্রথমা স্ত্রী লুইজির মৃত্যুর আগে তুমি অনেকবার ওর মৃত্যু কামনা করেছ, তাই না?

জ্বী, ডাক্তার। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছি ডাইনীটা যেন মারা যায়।

রাইট। তাই ও যখন মারা গেল তখন নিজের অবচেতন মনের কাছে অপরাধী হয়ে গেলে তুমি। ভাবলে এই মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমিই খুন করেছ ওকে। অ্যানকে যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলে তুমি, অবচেতন মনে আরেকটা চিন্তা আবার প্রবল হয়ে উঠল। তুমি ভাবলে লুইজি হয়তো সত্যিই মারা যায়নি। ও হয়তো হঠাৎ করেই ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে তোমার সকল সুখ ছারখার করে দেবে। আর তারপর থেকেই তুমি এই দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করো। সম্ভবত তোমার অ্যালার্ম ক্লকের ঘণ্টা ধ্বনি শুনে ঘুমের মধ্যে ভেবেছ ওটা টেলিফোনের শব্দ। আর তারপরই তুমি ওই স্বপ্নটা দেখতে শুরু করো। আর সেই স্বপ্নে একের পর এক হাজির হয়েছে লুইজি, রিচার্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছ তো, ডেভিড?

জ্বী, ডাক্তার। বুঝতে পারছি।

তাহলে তুমি কিছুক্ষণের জন্যে আবার বিশ্রাম নাও। আমি যখন তোমাকে জেগে উঠতে বলব শুধু তখন তুমি জেগে উঠবে। আর জেগে ওঠার পর থেকে তুমি এই দুঃস্বপ্নের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। তোমাকে এই স্বপ্ন আর কোনদিন তাড়া করবে না। এখন বিশ্রাম নাও, ডেভিড।

জ্বী, ডাক্তার।

আ, ডাক্তার ম্যানসন—

বলুন, মিসেস কার্পেন্টার?

আপনি কি নিশ্চিত ও আর কখনও এই স্বপ্ন দেখবে না?

অবশ্যই নিশ্চিত। ওর অবচেতন মনের অপরাধবোধ থেকেই এই দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি। আমি ওর অবচেতন মন থেকে সেই অপরাধবোধটুকু মুছে ফেললেই ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আর কোন সমস্যা থাকবে না।

তাহলে আমি বড়ই খুশি হব, ডাক্তার ম্যানসন। বেচারার জন্যে আমার যে কি কষ্ট হয়! ওহ্, মাফ করবেন, কলিংবেলের শব্দ শুনলাম। একটু দেখে আসি কে আবার এল।

ঠিক আছে, যান।

...ওহ্, এই লোকটি তো দেখি আমাদের জন্য অনেকগুলো কম্বল নিয়ে এসেছে। দেখি দেখি, কে পাঠাল। ওমাঃ, ডেভিডের বোন পাঠিয়েছে উপহার

হিসেবে। কম্বলগুলো খুব সুন্দর, না?

হ্যাঁ, খুব সুন্দর।

এগুলো আমি খুব যত্ন করে তুলে রাখব। হুম্! কোথায় রাখা যায়? এই তো মনে পড়েছে। ডেভিড় আমাদের এই জানালার ফোকরে বেশ বড় একটা সিন্দুক বানিয়েছে। সিন্দুকটা এয়ারটাইট। পোকায় ধরারও সম্ভাবনা নেই। ঠিক। এটার মধ্যেই এখন কম্বলগুলোকে রাখি।

ডেভিড, তুমি এখন সম্মোহিতের অবস্থা থেকে জেগে উঠতে পারো···বাঃ! এই তো জেগে উঠেছ দেখছি। কেমন লাগছে ডেভিড?

চমৎকার লাগছে, ডাক্তার। তবে আপনি ভুল করেছেন। আমি ডেভিড নই, রিচার্ড। তবে আমার একটা ব্যাপার ভেবে খুব অবাক লাগছে, ডেভিড আপনাকে যে গল্পটা শোনাল সেটা আপনি স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন। আপনার বোঝা উচিত ছিল সত্যকে গোপন করার জন্যে ডেভিডের ওটা একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু, আমি রিচার্ড কখনও মিথ্যে বলি না। সেদিন রাতে সত্যি কিন্তু ফোন বেজেছিল আর—অ্যান! ওকি করছ তুমি! না, না সিন্দুকটা খুলো না খুলো না বলছি!···ঠিক আছে, খুলেই যখন ফেলেছ, আর কিছু করার নেই আমার। আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। শুনলে তো না। এখন লাশটা দেখে ভয়ে যত খুশি চিৎকার করো, আমার কিছু যায় আসে না!

চোখের বদলে চোখ

মম রডেনবেরী তাঁর কন্যার মৃত্যু সংবাদ পাহাড়ী মহিলাদের মত শক্ত মুখে শুনলেন। তাঁর চেহারা থেকে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সরে গেল। ধূসর স্লেট রঙা চোখে ফুটে উঠল অদ্ভুত শূন্যতা। রোগা হাত দিয়ে গাল চেপে ধরলেন তিনি, ফাঁদে পড়া বেড়ালের মত করুণ বিলাপ বেরিয়ে আসতে লাগল পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

তারপর সিধে হলেন তিনি, কাফের কাউন্টারে হেলান দিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'গেথার···জার্ল ব্রাউনলী আমার মেয়েটাকে খুন করেছে?'

'জ্বী, ম্যাম।'

ন্যাপকিনে চোখ মুছে মম রডেনবেরী ভাঙা গলায় বললেন, 'প্রেটিকে কি ডাক্তার ওয়েদারলির কাছে পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছে?'

'জ্বী, ম্যাম।'

'আমাকে এখন একটু সঙ্গ দেবে, গেথার?'

'অবশ্যই দেব।'

'আমাকে সব কথা খুলে বলো।' আমার কব্জি চেপে ধরলেন তিনি শক্ত হাতে। 'কোন কিছু বাদ দেবে না। বুঝতে পেরেছ, গেথার?'

কাফের দরজার কাঁচে ঝোলানো কার্ডবোর্ডের সাইনবোর্ডটা মম রডেনবেরী উল্টে দিলেন। সাইনবোর্ডে 'কাফে বন্ধ' কথাটি ঝুলতে লাগল। আমরা ফুটপাথে চলে এলাম। মিসেস রডেনবেরী দরজা বন্ধ করলেন, মিনিটখানেক রাস্তার এধার-ওধারে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করলেন শহরে প্রথম আসা বহিরাগতদের মত।

'এই শহর আসলে স্বপ্ন দেখা তরুণীদের জন্যে নয়, গেথার। বিশেষ করে প্রেটির মত মেয়ের জন্যে তো নয়ই, যার প্রধান আকর্ষণ ছিল নতুন ডিজাইনের পোশাক আর রঙ ঝলমলে পার্টি।'

'কিন্তু তাতেই একটা মেয়ে খারাপ হয়ে যায় না, ম্যাম। বিশেষ করে প্রেটির মত মেয়ে।'

'আমি তা বলছিও না, গেথার। কিন্তু দুনিয়াটাকে ভাল করে বোঝার বয়সই তো ওর হয়ে ওঠেনি। এত সরল ছিল ও, দুনিয়ার অন্ধকার দিকগুলো চোখেই পড়ত না। আসলে ওর সরলতা আর অপূর্ব রূপই হয়েছে কাল।'

আমি কোন কথা বললাম না। মম রডেনবেরীর বেদনার স্বরূপ যেন মর্মে অনুভব করছিলাম। আসলেও প্রেটির কতই বা বয়স হয়েছিল? মাত্র আঠারো! পৃথিবীর রঙ রস সবে উপভোগ করতে শুরু করেছিল মেয়েটা।

'বলো, গেথার,' শান্ত গলায় বললেন মম রডেনবেরী। ডাক্তার ওয়েদারলীর বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে পুরো ঘটনাটা তাঁকে খুলে বললাম আমি।

খুবই নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে প্রেটিকে। ব্রাউনলীর বাড়িতে জার্লের সঙ্গে ওর ডেটিং ছিল। ব্রাউনলী বংশের শেষ বাতি জার্ল বংশানুক্রমে বিশাল সম্পত্তির মালিক। কাঠ আর তামাকের খুবই বড় ব্যবসা আছে তার। কাউকে পরোয়া করে না। টাকা দিয়ে মানুষজনকে কিনে ফেলার হম্বিতম্বি প্রায়ই করে সে। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি জার্লের লোভ প্রচণ্ড। আর মেয়ে পটাতেও দারুণ ওস্তাদ। প্রেটিকে তার প্রেমের ফাঁদে ফেলতে খুব একটা সময় লাগেনি জার্লের। ছোটবেলা থেকেই প্রেটি দুরন্ত, ছটফটে স্বভাবের। মফস্বল শহরের একঘেয়ে জীবনযাত্রা ওর ভাল লাগত না। ভাল লাগত পার্টি, ভাল পোশাক, দামী খাবার ইত্যাদি। তাই বলে হ্যাংলা স্বভাবের ছিল না প্রেটি। মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করত, কেউ যে ওর ক্ষতি করতে পারে এটা তার কল্পনাতেও আসত না। সুদর্শন জার্লের সঙ্গে প্রেটির পরিচয় তার এক বান্ধবীর বাড়ির পার্টিতে। প্রথম দর্শনে প্রেমের ব্যাপারটা প্রেটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেও খেলুড়ে জার্লের কাছে এসব বিশেষ কিছু অর্থ বহন করে না। প্রেটি ঘুণাক্ষরেও জার্লের দুরভিসন্ধি টের পায়নি। তাই জার্ল যখন তার খামার বাড়িতে প্রেটিকে এক গেট টুগেদার পার্টিতে দাওয়াত দেয়, খুশি মনেই সে দাওয়াত কবুল করেছিল প্রেটি।

পার্টি চলে একটানা তিনদিন। জার্লের আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে বিদায় নেয়ার পর তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে। কাঁধখোলা সাদা পোশাকে পরীর মত সুন্দরী প্রেটির ওপর মাতাল জার্ল খালি বাড়িতে চড়াও হয়। প্রেটির কল্পনাতেও আসেনি যাকে সে ভালবাসে তার প্রধান আকর্ষণ হৃদয় নয়, শরীর। আকস্মিক আক্রমণটা স্বভাবতই প্রাথমিক অবস্থায় হতবুদ্ধি করে তোলে প্রেটিকে। তারপর সে দয়া ভিক্ষা করতে থাকে জার্লের কাছে তার চরম সর্বনাশ না করার জন্যে। কিন্তু মদে চুর নারী লোভী জার্ল তখন কামুক এক পশুতে পরিণত হয়েছে। প্রেটিকে সে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে প্রেটি নিজের সম্মান বাঁচাতে প্রাণপণে বাধা দেয়, খামচে রক্তাক্ত করে তোলে জার্লের মুখ। যন্ত্রণা আর রাগে উন্মাদ জার্ল লাথি মেরে বিছানা থেকে প্রেটিকে ফেলে দেয়। তারপর ভারি কিছু, সম্ভবত ভারি ফার্নিচার বা এরকম কিছু একটা দিয়ে প্রেটির মাথায় আঘাত করে সে।

জার্ল ভেবেছিল প্রেটি মারা গেছে। প্রেটিকে টেনে হিঁচড়ে সে ঘর থেকে বের করে গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে এবং তার এলাকার বাইরে, বড় পাহাড়টার খাদে হতভাগ্য মেয়েটাকে ফেলে দিয়ে আসে। জার্ল হয়তো ভেবেছিল কেউ তার টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। প্রেটির লাশ খুঁজে পেতেও সপ্তাহখানেক লাগবে। আর পুলিস তাকে সন্দেহ করলেও কিছু আসে যায় না। সন্দেহ করা আর প্রমাণ করা, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সে সরাসরি অস্বীকার করে বসবে। বলবে প্রেটি কস্মিনকালেও তার খামার বাড়িতে আসেনি। জার্লের ধারণা ছিল কেউ তাকে লাশ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। প্রেটিকে স্থানীয়দের কেউ খামার বাড়িতে আসতে দেখেনি। কিন্তু ধারণাটা ভুল ছিল তার।

বহুদিন ধরে ব্রাউনলীদের এই খামার বাড়িতে এক বুড়ো কেয়ার টেকার থাকত। জার্লের জন্মেরও আগে থেকে সে এখানে ছিল। বুড়ো কিছুদিন আগে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে সে তার ভাতিজাকে ব্রাউনলীদের বাড়ি আর জমিজমার ওপরে

একটু নজর রাখতে বলেছিল। কিন্তু ফাঁকিবাজ ভাতিজা কালেভদ্রে এখানে আসে। ঘটনার দিন সে খুব ভোরে শিকারের লোভে খামারবাড়ির মাঠ দিয়ে পেছনের জঙ্গলের দিকে হনহন করে এগুচ্ছিল। হঠাৎ গাড়ির শব্দে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। মাঠের শেষপ্রান্তে, জঙ্গলের কিনারে একটা টিলার আড়ালে চট করে সে লুকিয়ে পড়ে এবং রক্তাক্ত প্রেটিকে হিঁচড়ে গাড়িতে ওঠানোর রোমহর্ষক দৃশ্যটা দেখতে পায়।

কিছুক্ষণ পর জার্ল খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে আসে এবং বাড়িতে ঢুকে তার ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে।

এই এলাকাটাকে নিজের হাতের তালুর মতই চেনে কেয়ার টেকারের ভাতিজা। মস্ত অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে বড় পাহাড়ী খাদটার দিকে ছুটতে থাকে। ওদিকেই সে জার্লকে গাড়ি নিয়ে যেতে দেখেছে। খাদের কাছে এসে পাথরের মত জমে যায় ভাতিজা। হাত-পা ছড়িয়ে খাদের মধ্যে পড়ে আছে প্রেটি। গাঢ় নীল চোখ দুটো খোলা। হলুদ, রক্তমাখা চুল লেপ্টে আছে মুখে, ঠোঁট নড়ছে প্রেটির। কি যেন বলতে চাইছে।

ভাতিজা মৃত্যুপথযাত্রী প্রেটির কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে, থেমে থেমে পুরো ঘটনা তাকে খুলে বলে প্রেটি।

তারপর ভাতিজা দৌড়ে আসে খামার বাড়িতে, জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ফোন করে কমফোর্ট শহরের শেরিফকে। শেরিফ কোলি লুডারমিল্ক আশপাশের সমস্ত শহর এবং গ্রামের শেরিফদের ঘটনাটা জানিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় বন্ধ করে দেয়া হয় রাস্তা।

জার্ল ব্রাউনলীর আর পালাবার উপায় নেই জেনে কোলি আমাকে, অর্থাৎ ডেপুটি গেথারকে চেহারা সনাক্ত করতে পাঠায়। পোস্টমর্টেমের জন্যে প্রেটির লাশ আমাকেই ডাক্তার ওয়েদারলীর বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়েছে। এমনকি দুঃসংবাদটা মম রডেনবেরীকে জানাবার দায়িত্বও আমার ওপর বর্তেছিল।

কোন বাধা না দিয়ে চুপচাপ আমার গল্প শুনলেন মম। ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন তিনি। চেহারায় এখন কোন ভাব নেই।

ডাক্তার ওয়েদারলীর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। মম রডেনবেরী আমার চিবুক ছুঁয়ে বললেন, 'তুমি খুব ভাল ছেলে, গেথার জোন্স। আমাকে পুরো ঘটনাটা খুলে বলার জন্যে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আরও বাড়ল।'

আমি ম্লান গলায় বললাম, 'প্রেটি বড় ভাল মেয়ে ছিল, ম্যাম। ওকে আসলে লোভ দেখানো হয়েছিল। শেষের দিকে বন্ধুবান্ধবদের প্রতি ওর মোহটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল, উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল কঠিন বাস্তবতা। একথা আপনি নিজেই আমাকে বহুবার বলেছেন, ম্যাম।'

'হ্যাঁ, গেথার। আমার মনে আছে।'

'যাকগে, আপনি নিশ্চিত থাকুন আমরা জার্ল ব্রাউনলীকে ধরবই।'

ধীরে ধীরে চোখ তুলে চাইলেন মম রডেনবেরী। যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল তাঁর কণ্ঠ, 'ক্ষতি আমার যা হবার তা হয়েছে। এ নিয়ে আর দুঃখ করি না। কিন্তু আমি ন্যায়বিচার চাই, গেথার। চোখের বদলে চোখ চাই। প্রেটিকে কবরে শান্তিতে

ঘুমাতে দিতে চাইলে জার্ল ব্রাউনলীকে তার কৃতকর্মের শাস্তি পেতেই হবে।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না আমি। কারণ মম রডেনবেরীর মত আমিও পাহাড়ী মানুষ।

'আবারও তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, গেথার। জানি এখন তোমাকে কাজে যেতে হবে। ঠিক আছে, যাও। আমি শেষ কয়েকটা মিনিট আমার মেয়ের সঙ্গে একান্তে কাটাতে চাই। একা।' বললেন তিনি।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন মম রডেনবেরী, আমার মনে হলো প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বয়স যেন দশ বছর করে বেড়ে যাচ্ছে। পোস্টমর্টেম ঘরের দরজা খুলে গেল, অন্ধকার গ্রাস করল তাঁকে। আমি হাঁটা দিলাম অফিসের উদ্দেশে।

খানিকটা পথ যেতেই পকেটের মধ্যে ওয়াকি-টকিটা ঘড় ঘড় করে উঠল।

'গেথার, কোন্ চুলোয় গিয়ে সেঁধিয়েছ তুমি?' শেরিফ কোলি লাউডারমিল্কের ধাতব, খনখনে কণ্ঠ ভেসে এল বাতাসে।

'তাস খেলছি আর মদ গিলছি,' তেতো গলায় বললাম আমি। রাস্তার মাথায়, কাফের দরজায় ঝোলানো 'কাফে বন্ধ' সাইনবোর্ডটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলাম, 'জার্ল ব্রাউনলীকে ধরতে পেরেছেন?'

যেন বিস্ফোরিত হলো ওয়াকি-টকি। 'হারামজাদাটা আমার গাড়ি মিডেন ফলস রোড ব্লক করে আছে দেখে ফুটপাথ দিয়ে পালাবার সময় বার দুই গাড়ি নিয়ে ডিগবাজি খেয়েছে, তারপরও হাল না ছেড়ে সোজা পাহাড়ী এলাকার দিকে লেজ গুটিয়ে দৌড়েছে।'

'ও নিশ্চয়ই আহত হয়েছে? রক্তক্ষরণে মরবার চান্স কতটুকু?' উৎসুক গলায় জানতে চাইলাম।

'না, অতটা বোধহয় আহত হয়নি। ওর পিছু নিয়েছিলাম আমি, কিন্তু ক্যাটট্র্যাক হোলারের গিরিখাদের কাছে ওকে হারিয়ে ফেলি। সন্ধ্যার আগে খুঁজে বের করতে না পারলে আমরা ওকে চিরতরে হারাব। কারণ এই এলাকা ও আমাদের চেয়েও ভাল চেনে। আত্মগোপন কোন সমস্যাই হবে না ওর জন্যে।'

'আমি তাহলে রেডরানার আর ওল্ড বেইলিকে নিয়ে আসি?'

'নিয়ে এসো, নিয়ে এসো।' অসহিষ্ণু গলায় বলল শেরিফ। 'ওদেরকেই এখন কাজে লাগাতে হবে। আর সময় নষ্ট কোরো না।'

'কথা বলে আপনিই তো খামোকা সময় নষ্ট করলেন,' বিরক্ত হয়ে বললাম আমি। ওয়াকি-টকির সুইচ অফ করে দিলাম।

অফিসের পেছনে, ইঁটের পুরানো দালানটাকে আমরা জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করি। ওল্ড বেইলি আর রেডরানার ভেতরে বাঁধা থাকে। গেট খোলার শব্দে ওরা ঘেউ ঘেউ করে উঠল। আমাদের এই ব্লাডহাউন্ড দুটোর গন্ধ শুঁকে পলাতকদের সন্ধান করতে জুড়ি নেই। ওদের নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

হাড্ডিসার কোলিকে দেখলে মনে হয় পাহাড়ী এই এলাকায় তীব্র শীতের মধ্যে একটা দিনও টিকে থাকতে পারবেন না। কিন্তু নিজস্ব দায়িত্ব পালনে কোলির মত দক্ষ দ্বিতীয় আর কাউকে চোখে পড়েনি আমার। বিশ বছর ধরে কমফোর্ট শহরের

শেরিফ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা এবং সম্মানের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আর কোলির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর আমি বুঝতে পারি এসব দুর্গম, বিপজ্জনক এলাকায় শেরিফ হিসেবে একমাত্র তিনিই মানানসই।

কোলি লাউডার মিল্কের নির্দেশিত গিরিখাদের পাদদেশে যখন পৌঁছুলাম, তখন অস্তগামী সূর্য পাটে বসার আয়োজন করছে। পশ্চিমের গোটা আকাশ জুড়ে লাল আগুনের খেলা, রক্তিম রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড় চুড়ো আর দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকায়।

শেরিফ আমাকে অত্যন্ত দামী একটা স্পোর্টস জ্যাকেট দেখালেন। আমার গোটা মাসের বেতন লাগবে এই জিনিস কিনতে।

'জার্ল ব্রাউনলীর ভাঙা গাড়ির ব্যাকসীটে এটাকে পেয়েছি।' বললেন কোলি, 'সম্ভবত ওরই। পালাবার সময় ফেলে গেছে।'

কোলি ব্লাডহাউন্ড দুটোকে জ্যাকেটের গন্ধ শোঁকালেন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওরা। আমি বেল্ট ধরে থাকলাম, ওল্ড বেইলি আর রেডরানার নাক কুঁচকে চারপাশের গন্ধ শুঁকল। তারপর রক্ত জল করা এক চিৎকার দিল। আমার হাত থেকে ছুটে প্রায় বেরিয়ে যেতে চাইল। শুরু হলো অনুসরণ।

পরবর্তী একটা ঘণ্টা যেন ঝড় বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে। কোলি একটা ঢালে পা ফস্কে নিচে পড়ে গিয়ে হাঁটু আর কনুইয়ের অনেকখানি চামড়া হারালেন। তবে ঢালটার পেছনে, লম্বা এবং নগ্ন একটা পাথুরে চাতালের আড়ালে আত্মগোপনকারী জার্ল ব্রাউনলীর সন্ধান পেয়ে গেলাম আমরা। আমাদের দেখে লাফিয়ে উঠল জার্ল, ভীত খরগোশের মত দৌড় শুরু করল। মিনিট দশেক যেন চোর-পুলিস খেললাম আমরা ওর সঙ্গে। এবারও একটুর জন্যে আমাদের ফাঁকি দিল সে। পুরানো একটা ট্রেইল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

ঘেমে নেয়ে উঠেছি আমরা দু'জনে। কুকুর দুটো জিভ বের করে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু হাল ছাড়লাম না। ঢুকে পড়লাম ঘন জঙ্গলের মধ্যে। জার্লকে ধরতে পারব কিনা সন্দেহ হচ্ছিল আমার। কারণ দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। হালকা অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করেছে ঘন ঝোপে।

হঠাৎ দেখি কোলি সাঁ করে আমাদের সামনে থেকে জ্যা মুক্ত তীরের মত ছুটে গেলেন। সামনেই একটা নালার মত, তার ধারে একটা বেতের ঝোপ। নালাটা মাড়িয়ে ঝোপ লক্ষ্য করে ড্রাইভ দিলেন কোলি। পরক্ষণে প্রবল একটা হুটোপুটির শব্দ। যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে ঝোপের মধ্যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরিয়ে এল, বাতাসে উড়তে লাগল ছিন্ন পালক।

কুকুর দুটোকে নিয়ে আমি নালা পার হচ্ছি, এই সময় কোলি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। কলার চেপে ধরে আছেন জার্ল ব্রাউনলীর।

'শেষ পর্যন্ত ধরেছি ব্যাটাকে,' নাকের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন কোলি।

'দারুণ দেখিয়েছেন, শেরিফ,' আমি নড করলাম।

জার্লের চেহারা বিধ্বস্ত। মুখে আঁচড়ের দাগ, বেঢপ ফুলে আছে কপাল। ডান হাতেও ছোটখাট একটা আলু গজিয়েছে, লক্ষ করলাম। জামা কাপড় ছিন্নভিন্ন। দেখে কে বলবে এই শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী, ধনী এবং সৌখিন লোক সে।

ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে শেরিফের গাড়িতে নিয়ে তুললাম। কুকুর দুটো সামনে, কোলির সঙ্গে বসল। আমি পেছনে বসলাম কয়েদীকে পাহারা দিতে। যদিও এই শরীর নিয়ে জার্ল পালাবে বলে মনে হয় না।

সারা রাস্তায় জার্ল একটা কথাও বলল না। সারাক্ষণ কি যেন ভাবল, এমন কি যখন সেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলাম তখনও ওকে চিন্তামগ্ন দেখলাম। যেন আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়।

ঢুলু ঢুলু চোখে সে আমাকে সেলে তালা লাগাতে দেখল। তীব্র বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ঠোঁট একদিকে বেঁকে গেল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল জার্ল। 'তোমরা কি ভেবেছ জেলে পুরে দিলেই আমার শাস্তি হবে?'

'আ-রা তাই মনে করি,' শান্ত গলায় বললাম আমি।

'গাধা কোথাকার!' চিৎকার করে বলল সে। 'জানো আমি কে, তারপরও এই কথা বলো কোন সাহসে? জানো, টাকা দিয়ে আমি সবাইকে কিনে নিতে পারি? নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলস থেকে সমস্ত সেরা উকিল নিয়ে আসব আমি মামলা লড়ার জন্যে। জুরিদের কিনে নেব, সেইসঙ্গে বিচারপতিকেও। আইনের হাজার ফাঁক আছে, আইন ফাঁকি দেয়ার হাজার উপায় আছে। ওই ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাব আমি। দেশের সেরা আদালতে মামলা লড়ব, যতদিন লাগুক। আমার বিচার করবে ওরকম সস্তা সেন্টিমেন্টের কথা বাদ দিয়ে একটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি, গেথার। তুমি কি কখনও শুনেছ এ দেশে কোন কোটিপতির জীবনাবসান হয়েছে গ্যাস চেম্বার কিংবা ইলেকট্রিক চেয়ারে?'

জার্ল ব্রাউনলীর কোন কথারই জবাব দিলাম না আমি। কিন্তু রাস্তায় হাঁটার সময় ওর প্রতিটি কথা দড়াম দড়াম বাড়ি খেতে লাগল মস্তিষ্কে। হাঁটতে হাঁটতে মম রডেনবেরীর কাফেতে চলে এলাম। 'কাফে বন্ধ' সাইনবোর্ডটা এখনও দরজার পেছনে ঝুলছে বটে, তবে ওপরতলায়, মম এবং প্রেটির শোবার ঘরে, আলো জ্বলছে দেখলাম। আমি বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন মম নিজেই। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি জানি খুঁজলেন, তারপর ভেতরে আসতে বললেন।

আমি একটা সোফায় বসলাম। আমার সামনে একটা চেয়ার দখল করলেন মম। কঠিন এক নীরবতা কিছুক্ষণ বিরাজ করল ঘরটাতে।

তারপর তিনি বললেন, 'গেথার, খবর পেয়েছি তোমরা ওকে ধরেছ। জেলেও ঢুকিয়েছ।'

'জ্বী, ম্যাম। কিন্তু ভয় হচ্ছে লোকটা আমাদের হাত ফস্কে চলে যেতে পারে।'

'কেন, গেথার। আমরা জানি সে কাজটা করেছে। ঠাণ্ডা মাথায়, নৃশংসভাবে। প্রেটি বলেছিল গেথার ওকে মেরেছে—মৃত্যুপথযাত্রী কেউ নিশ্চই মিথ্যা বলবে না।'

'আমি তা জানি। কিন্তু আমাদের সাক্ষীসাবুদ দরকার। আমরা এক সাক্ষীকে পেয়েছি সে প্রেটির কথা আমাদের বলেছে। কিন্তু খামারবাড়ির মৃত কেয়ার টেকারের ভাতিজার এই কথা ওরা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। বলবে এটা স্রেফ শোনা কথা। জার্ল যেসব আইনজীবী নিয়োগ করবে, আমার বলতে ভয় হচ্ছে, তারা রাতকে দিন করে ফেলতে পারবে।'

মম রডেনবেরী কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর ধূসর চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। 'একই খেলা দু'জনেও খেলা যায়, গেথার।'

কপাল কুঁচকে বললাম, 'ঠিক বুঝলাম না, ম্যাম।'

'কন্যা শোকে কাতর মা যদি সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে তাহলে কি আমাদের পাহাড়ী জুরিরা তাকে অভিযুক্ত করবে, গেথার?'

মম কি বলতে চাইছেন বুঝতে পেরে আমার ঘাড়ের পেছনের চুল সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল।

মম রডেনবেরী আস্তে চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন। 'তোমাদের জেলখানায় নতুন কোন কয়েদী এলে খাবারটা তো আমার এই কাফে থেকেই পাঠানো হয়, তাই না, গেথার? আজ রাতে আবার এক কয়েদী এসেছে। আমি নিচে যাচ্ছি, গেথার, লোকটার জন্য রান্না করতে। তুমি বোধহয় ওর খাবার নেয়ার জন্যেই এসেছ?'

খাবি খেলাম আমি, 'ইয়ে মানে ম্যাম···জ্বী, জ্বী!'

'চমৎকার, সুস্বাদু খাবার পাঠাব ওর জন্যে,' আমার কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বললেন তিনি। 'দেখে জিভে জল এসে যাবে। তবে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো যেন আবার রেডরানার এবং ওল্ড বেইলিকে খাওয়াতে যেয়ো না, খবরদার!'

'তা যাব না,' প্রতিশ্রুতি দিলাম আমি। 'কারণ আমার খানদানী কুকুর দুটো আজকে রাতের উচ্ছিষ্ট খাবারের চেয়ে আরও ভাল কিছু পাবার দাবি রাখে।'

পরকীয়া

জন জনসন ঠিক করেছে সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হত্যা করবে। এছাড়া তার কোন উপায় নেই। আর একমাত্র এই কাজটাই সে খুব ভালভাবে করতে পারবে। অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন।

ডিভোর্স দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ডিভোর্সের জন্যে সে উপযুক্ত কারণও দাঁড় করাতে পারবে না। মেরী এত ভাল আর ভদ্র যে জীবনে কোন পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। এতদিনে একটিবারও সে জনের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। মেরী যেমন সুন্দরী, রান্নার হাতটিও তেমনি চমৎকার। আর ওর মত দক্ষ ব্রিজ খেলোয়াড় এ শহরে আর কেউ আছে? মেরী সবার কাছেই খুব প্রিয়।

ভাবতেও কষ্টে বুক ফেটে যেতে চায় যে এমন সুশীলা, সুভদ্রা একটি নারীকে তার হত্যা করতে হবে। কিন্তু ওকে ডিভোর্সও দেয়া যাবে না। বিশেষ করে এই সময়, যখন মাত্র মাস দুয়েক আগে তারা তাদের বিংশত বিবাহবার্ষিকী মহাসমারোহে পালন করেছে। আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই বলছিল, মেরী আর জন হচ্ছে একালের শ্রেষ্ঠ এবং সুখী দম্পতি। শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে খুলতে মেরী এবং জন সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিল, পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে প্রগাঢ় ভালবাসায় উচ্চারণ করেছিল, 'আপনারা আশীর্বাদ করবেন আমরা যেন একসঙ্গে মরতে পারি।' আর এরপর জন কি করে পারে মেরীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে? এটা স্রেফ ছেলেমানুষী হবে।

তাকে ছাড়া মেরী একদণ্ড বাঁচতে পারবে না, জানে জন। ডিভোর্স দিলেও দোকানঘরটা মেরীর নিজেরই থাকবে। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। কারণ মেরী অর্থলিপ্সু নয়। জন বাইরে গেলে সে ফার্নিচারের দোকানটাতে বসে সময় কাটায়। ব্যবসা বুদ্ধি যদিও ভালই মেরীর, কিন্তু এসবের প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। তার সকল আগ্রহ জনকে ঘিরে।

জন যদি মেরীকে ডিভোর্স দেয় তাহলে কে তাকে কনসার্টে নিয়ে যাবে, কে যাবে তার সঙ্গে নাটক দেখতে। তার সবচে' প্রিয় জিনিস 'ডিনার পার্টি' জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। স্বামী পরিত্যক্তা মেরীকে কুশল জিজ্ঞেস করতেও কেউ আসবে না। একা, ডিভোর্সি মেরী বদ্ধ হয়ে পড়বে চার দেয়ালের মাঝখানে, কাটাতে হবে দুর্বিষহ জীবন। না-না, মেরীর এমন ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারে না জন। যদিও জানে মেরীকে যদি সে বলে, 'আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব,' তাহলেও মেরী কোন প্রতিবাদ করবে না। এমনই বাধ্য মেয়ে সে।

নাহ্, ডিভোর্সের কথা বলে মেরীকে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার কোন মানে নেই। এত কষ্ট পাবার জন্য জন্ম হয়নি ভাল মেয়েটির।

ইস, যদি গতবারের বিজনেস ট্রিপে লেটিসের সঙ্গে তার পরিচয় না হত! কিন্তু জন এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে অস্বীকার করবে কিভাবে? লেটিসের সঙ্গে পরিচয়

হওয়ার পর, গত ছয়মাস থেকে মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে সে। লেটিসের তুলনায় মেরী কিছুই না। লেটিসকে দেখার পর তার মনে হয়েছে সে যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। সারাজীবন সে কালা ছিল, এখন শুনতে পাচ্ছে। আর অলৌকিক ব্যাপারটা হচ্ছে লেটিসও তাকে ভালবেসেছে এবং বিয়ে করতে চাইছে, তার কোন পিছুটান নেই।

লেটিস অপেক্ষা করছে।

আর জেদ ধরছে।

ভালবাসার এই দৃশ্যপট থেকে মেরীকে বাদ দিতেই হবে। ছোটখাট একটা দুর্ঘটনা ঘটলে ব্যাপারটা বেশ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আর দুর্ঘটনা ঘটা বা ঘটাবার জায়গা হিসেবে দোকানটা সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মেরীর মাথার ওপরের তাকে মার্বেল পাথরের যেসব ভারি আবক্ষ মূর্তি এবং ঝাড়বাতি রয়েছে তার দু'একটা যদি পিছলে মাথার ওপর পড়ে যায় তাহলেই কেল্লা ফতে।

'ডার্লিং, তোমার বউকে কথাটা বলতেই হবে,' লেক্সিংটনের হোটেলঘরে লেটিস জনের গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলছিল। 'ওকে তোমার ডিভোর্স করতেই হবে। আমাদের সম্পর্কের কথা তুমি এখনও মেরীকে জানাচ্ছ না কেন?' লেটিসের কণ্ঠ এত নরম আর মিষ্টি যে জনের মনে হচ্ছিল সে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু লেটিসের কথা সে কি করে মেরীকে জানাবে?

লেটিসের আবেদন জনের কাছে মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় না।

মেরীর চেহারা বা আচরণে স্বাভাবিক মাধুর্য লক্ষ্যণীয়, কিন্তু লেটিস বেশভূষায় আড়ম্বরপূর্ণ। লেটিস মেরীর মত সুন্দরী না হলেও বিছানায় ওর তুলনা মেলা ভার। লেটিসের উপস্থিতিতে অসাধারণ খেলুড়ে হয়ে ওঠে জন; কিন্তু মেরীর সঙ্গে তার আচরণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ স্বামীর মত, রক্ষণশীলতা এখানে অনেকটাই ভূমিকা রাখে। লেটিস কামকলার যে ছলাকলা জানে মেরী হয়তো সেগুলোর নামও জীবনে শোনেনি। লেটিস মানে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ, প্রকৃতির চারটি উপাদান; মেরী মানে—থাক, সে এগুলোর সঙ্গে ওর তুলনা করতে চায় না। পরস্পরের সঙ্গে এত তুলনা করেই বা কি লাভ?

বিছানায় ঝড় তুলে পরিতৃপ্ত জন লেটিসকে নিয়ে নিচে এসেছে, বার-এ লেটিস যাবে কিনা জানার জন্যে প্রশ্ন করতে যাচ্ছে, এমন সময় চেট ফ্লেমিংকে হোটেলে ঢুকতে দেখল ও। লবি পার হয়ে সোজা ডেস্কের দিকে আসছে। চেট ফ্লেমিং লেক্সিংটনে কি করছে? দরকারী কাজে যে কেউ এখানে আসতেই পারে। নাহ্, প্রকাশ্যে লেটিসকে নিয়ে ঘোরাঘুরি বড্ড ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় ওরা ধরা খেতে পারে। কোন জায়গাই ওদের জন্যে নিরাপদ নয়। আর চেট ফ্লেমিং ওদের দেখে ফেললে কম্ম সাবাড়। বাচালটা দুনিয়ার লোককে জানিয়ে দেবে জনের সঙ্গে এক সুন্দরীকে সে হোটেলে দেখেছে। আর মেরীর কানে তো সব কথা যাবেই। ওর অন্তরটা তখন টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু অত বেদনা অবশ্যই মেরীর প্রাপ্য নয়।

জন চট করে লেটিসের পেছনে লুকাল। চেট খামোকা ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে

রিসেপশনিস্টের সঙ্গে বকবক করতে লাগল। চোখ তুলে তাকালেই চেট তাদেরকে দেখতে পাবে ভেবে জন পাশের নিউজস্ট্যান্ডের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। চট করে একটা পত্রিকা নিয়ে মুখ আড়াল করে পড়ার ভান করল। চেট রেজিস্টারে সই করে লিফটে না ওঠা পর্যন্ত সে ওই ভাবেই থাকল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক বাবা, বড় একটা ফাঁড়া কাটল।

জন আর ঝুঁকি নিতে চায় না। লেটিসের সঙ্গে তার সম্পর্কটাকে চিরস্থায়ী বন্ধনে না বাঁধা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। কিন্তু একই সঙ্গে মেরীকেও যে তার আঘাত দিতে ইচ্ছে করছে না।

আমেরিকায় হাজার হাজার মানুষ ঘুমের মধ্যে মারা যায়। মেরী কেন তাদের একজন হয় না? কেন তাকে খুন হতে হবে?

জন তার আতঙ্কের কথা খুলে বলল লেটিসকে, আবার যখন লেক্সিংটনে গেল সে।

শুনে মাথা নাড়ল লেটিস। বলল: 'ডার্লিং, এই কাজ করলে আমিও ফেঁসে যাব। কারণ সবাই তখন আমাকেও সন্দেহ করবে। আমি বলি কি, তোমার বউকে আমার কথা এখুনি বলে ফেলো। আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না। কিছু একটা করো।'

'হ্যাঁ, সোনা। ঠিক বলেছ তুমি। কিছু একটা করব আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

আশ্চর্য হলেও সত্যি, মেরী জনসনও তার স্বামীর মত অবস্থায় পড়েছে। প্রেমে পড়ার কথা কল্পনাও করেনি সে। তার বিশ্বাস ছিল সে শুধু জনকেই ভালবাসে। কিন্তু কেনেথকে দেখার পরেই মাথায় কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সেদিন সকালে কেনেথ দোকানে এসে জিজ্ঞেস করছিল মেরীর কাছে মোৎসার্টের আবক্ষ মূর্তি আছে কিনা। হ্যাঁ, তা অবশ্য মেরীর কাছে ছিল; শুধু মোৎসার্ট কেন, বাখ, বিটোফেন, ভিক্টর হুগো, বালজাক, শেক্সপীয়র, জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যেটে কার মূর্তি নেই তার কাছে?

নিজের পরিচয় দিল কেনেথ। যদিও খদ্দেররা সাধারণত নিজের পরিচয় দেয় না। আসে, দামদর করে জিনিসপত্র কিনে চলে যায়। মেরীও কেনেথকে তার নাম বলল। জানল কেনেথ এই শহরের একজন খ্যাতনামা ইনটেরিয়র ডিজাইনার।

'সত্যি বলতে কি,' বলল কেনেথ, 'মোৎসার্টের এই মূর্তিটি আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি, বরং এটা ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তবুও এটাকেই আমার নিতে হবে। কারণ আমার ক্লায়েন্টের মোৎসার্টের মূর্তি চাইই। আচ্ছা, এছাড়া আপনার কাছে অন্য কি মূর্তি আছে দেখাবেন দয়া করে?'

গোটা দোকান ঘুরিয়ে দেখাল মেরী কেনেথকে। তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েক দিন। পরে মেরী চেষ্টা করেছে মনে করতে সে কবে কেনেথের প্রেমে পড়ল; কিন্তু মনে পড়েনি। ওইদিন সারাটা সকাল কেনেথ দোকানেই ছিল; দুপুরের দিকে পেছনের চেস্ট অভ ড্রয়ার রাখা ছোট ঘরটায় সে কি এক অজুহাতে ঢুকে পড়ে। একটা ড্রয়ার টান দিতেই ওটা তার হাতে খুলে আসে, তারপর তার আচরণ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। মেরীকে জড়িয়ে ধরে কেনেথ।

'আরে, একি করছেন আপনি?' কৃত্রিম রাগে হিসহিস করে ওঠে মেরী। 'ঈশ্বর, যে কোন সময় কাস্টমার চলে আসবে!'

'গুল্লি মারো কাস্টমার,' বলেছে কেনেথ।

মেরীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না এসব ঘটছে। কেনেথের পুরুষালী বন্ধনের মাঝে নিজেকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল সে। কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সেবার সে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এরপর থেকে যখনই জন ব্যবসার কাজে শহরের বাইরে গেছে, প্রতিবারই কেনেথকে চুমু খেয়ে ঝিকমিকে চোখে জানিয়েছে আজকের রাতটা সে বাড়িতে একা।

চেস্ট অভ ড্রয়ারে গাদা করা পেছনের ঘরটা মেরী আর জনের মিলনের গোপন স্থান হিসেবে চমৎকার ছিল। একদিন, জনের অনুপস্থিতিতে ওরা ওখানে বসে প্রেম করছে এই সময় একটা কণ্ঠ শুনতে পেল। ভালবাসায় এত মগ্ন ছিল দু'জনে যে খেয়ালই করেনি কেউ এসেছে।

'মিসেস জনসন, কোথায় গেলেন? আমার জিনিসটা নিতে এসেছি,' বলল নারীকণ্ঠ।

হুড়মুড়িয়ে অন্ধকার ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল মেরী, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি। এলোমেলো চুল দ্রুত হাতে ঠিক করল সে। জানে ওর লিপস্টিক ছেবড়া থেবড়া হয়ে গেছে। খদ্দেরটি মিসেস ব্রায়ান, শহরের সবচে' গপ্পবাজ মহিলা। ভয় পেল মেরী। কোন সন্দেহ নেই মিসেস ব্রায়ান সবাইকে জানিয়ে দেবেন মেরীকে আজ তিনি আলুথালু অবস্থায় আবিষ্কার করেছেন। আর জনের কানে এই কথা যাবেই।

কিন্তু ভাগ্য ভাল মেরীর মিসেস ব্রায়ান আজ অন্য মুডে ছিলেন। মেরীর দিকে ভাল করে তাকালেন না পর্যন্ত। অর্ডার দেয়া ছিল আগেই, মেরীও প্যাক করে রেখেছিল ঝাড়বাতিটা, টাকা দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে হনহন করে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটা মেরী হাসিমুখে বললেও তার প্রেমিক অন্ধকার করে ফেলল মুখ।

'তোমাকে আমি কত ভালবাসি তুমি জানো, সোনা,' বলল কেনেথ। 'আর তুমিও আমাকে আমার মতই ভালবাস। কিন্তু এভাবে লুকিয়ে প্রেম করতে আমার জঘন্য লাগছে। এসব লুকোচুরি আমার পছন্দ নয়। বুঝতে পেরেছ কি বলতে চাইছি? আমরা বিয়ে করব। তোমার স্বামীকে বলো, তুমি ডিভোর্স চাও।'

কেনেথ কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করল, যেন এটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু যে মানুষটি গত বিশ বছর ধরে তার প্রতি এত সদয় এবং বিশ্বস্ত থেকেছে তাকে কি করে ডিভোর্সের কথা বলবে মেরী? কি করে সে তার সকল সুখ কেড়ে নেবে?

হ্যাঁ, ব্যাপারটার একটা সমাধান হতে পারে যদি জন হুট করে মরে যায়। কেন, ওর কি হার্ট অ্যাটাক হতে পারে না? প্রতিদিন কত মানুষ হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছে। জন কেন এভাবে মারা যায় না? তাহলেই আর কোন সমস্যা থাকে না।

সেদিন বিকেলে মেরী কেনেথকে ফোন করেছিল, বলল যে আজ রাতে জন বাড়ি ফিরবে না, কাজে শহরের বাইরে গেছে।

শুনে কেনেথ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বলল, 'ড্যাম ইট, মেরী! এভাবে লুকিয়ে বারবার দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা আমার জন্যে রীতিমত অপমানকর। তোমার সঙ্গে আমি অন্ধকার ঘরে প্রেম করব আর ওদিকে কাস্টমার এসে অমুক তমুক জিনিসের জন্য চিল্লাচিল্লি করতে থাকবে—ওহ্, এ অসহ্য! আমাকে অবশ্যই তোমার বিয়ে করতে হবে।'

'করব তো, ডার্লিং, কিন্তু আরেকটু ধৈর্য ধরো, প্লীজ।'

'অনেক ধৈর্য ধরেছি। আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।' ঘটাং করে ওপাশে ফোন রেখে দিল কেনেথ।

মেরী জানে কেনেথ যা বলেছে তা করবে। কিন্তু কেনেথকে ছাড়া সে বাঁচবে কেমন করে? জনের প্রতি তো তার এত ব্যাকুলতা ছিল না!

প্রিয় জন। কেমন করে সে তাকে ছেড়ে আসবে? জীবনের অন্যতম সেরা দিনগুলো সে জনের সঙ্গে কাটিয়েছে, জনের সমস্ত উপস্থিতি ছিল তাকে ঘিরে। তার আনন্দ, সুখ আহ্লাদের প্রতি জনের সবসময় নজর ছিল। ওদের যেসব বন্ধু-বান্ধব আছে সবাই বিবাহিত। জনকে ডিভোর্স দিলে তাকে একাই দিন কাটাতে হবে। মেরীকে ছাড়া তার জীবন শূন্য হয়ে পড়বে; বন্ধুরা তাকে তখন করুণা করে তাদের বাসায় ডাকবে। সবাই তাকে বেচারী, দুঃখী জন বলে সম্বোধন করবে। এরচে' মৃত্যুও অনেক ভাল ছিল, বলবে তারা। জীবন সম্পর্কে হতাশ জন তখন নিজেকে অবহেলা করতে শুরু করবে; ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করবে না; সমস্ত সময় তাকে এই বাড়িতে একা থাকতে হবে। না, জনকে জেনেশুনে সে এমন নির্বাসন দিতে পারে না।

কিন্তু কেনেথের জন্যে সে এত পাগল হলো কেন? কেনেথের ক্লায়েন্টই বা কেন তখন মোৎসার্টের মূর্তির জন্য বায়না ধরেছিল? ব্রড স্ট্রীটের সেকেন্ডহ্যান্ড দোকানগুলোতে মোৎসার্টের মূর্তি কত সস্তায় পেত কেনেথ। কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে মেরীর দোকানেই বা কেন সেদিন এসেছিল?

এখন আর এসব ভেবে কি লাভ? কেনেথের সঙ্গে সে এখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে, এ থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। দু'জনের মিলনই এর অনিবার্য পরিণতি।

কিন্তু পরিণতিকে অনিবার্য করতে হলে তাকে এখন ভাবতে হবে কত দ্রুত, সুন্দর, সহজ এবং দক্ষভাবে জনের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

আর খুব তাড়াতাড়ি।

ব্যবসার কাজে দিন তিনেকের জন্য বাইরে গিয়েছিল জন জনসন। লেটিসের সঙ্গে সুখসায়রে গা ভাসিয়েছে সে এই ক'টা দিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে মেরীকে দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। মেরীকে এত সুন্দরী মনে হয়নি তার জীবনেও। এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হলো মেরী ছাড়া তার জীবন বৃথা। কিন্তু পরক্ষণে লেটিসের মুখ মনের আয়নায় ভেসে উঠল। সিদ্ধান্ত নিল কাজটা সে আজই করবে। আজকেই সে মেরীকে খুন করবে। তবে কাজটা করবে রাতে। মেরীর সঙ্গে খুশি মনে ডিনার খাবে। মেরী নিশ্চই আজকেও ওর জন্যে চমৎকার সব জিনিস রান্না করে রেখেছে।

প্রতিবারই করে, বাইরে থেকে ফেরার পরেই। খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে সে মেরীকে চিরতরে বিদায় দেবে এই দুনিয়া থেকে।

কিন্তু মেরীকে কিভাবে হত্যা করবে সেটা এখনও ঠিক করতে পারেনি জন। সুযোগ মিললে দু'একটা মূর্তি ফেলে দেবে ওর মাথায়। নয়তো অন্য কোন উপায় পরে ভেবে বের করা যাবে।

মেরী ঠোঁটে মধুর হাসির রেখা টেনে জনের হাতে কফির কাপটা দিল।

'নাও, কফি খাও,' বলল সে। 'লম্বা ভ্রমণের ক্লান্তি অনেকটাই কেটে যাবে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল জন। এই মুহূর্তে সত্যি তার এককাপ গরম কফির খুব দরকার ছিল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে টেবিলের পাশে বসা মেরীর দিকে তাকাল জন। ওর চেহারায় অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি। অবাক হলো জন। গত বিশটা বছর ধরে ওরা পরস্পরের এত কাছে যে সহজেই একে অপরের মনের কথা পড়তে পারে। তাহলে কি মেরী বুঝে ফেলেছে জন তাকে নিয়ে কি ভাবছে? হাসল মেরী; হানিমুনের সেই প্রথম দিনগুলোর মন পাগলকরা নিষ্পাপ হাসি। নাহ্, মেরী কিছু টের পায়নি। অযথাই সে সন্দেহ করছিল ওকে।

'ডার্লিং, এক মিনিট,' বলল মেরী। 'দোকানে একটা জিনিস ফেলে এসেছি। ওটা এখুনি নিয়ে আসছি।'

উঠে দাঁড়াল মেরী, দ্রুত বেরিয়ে গেল ডাইনিং রুম থেকে, হলওয়ে দিয়ে ঢুকল দোকানে।

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে ফিরল না মেরী। কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে দেখে জন দ্রুত চুমুক দিল কাপে। তারপর সিধে হলো, মেরী দেরি করছে কেন দেখবে।

নিঃশব্দে দোকানে ঢুকল জন। মিডলরুমে, ঝাড়বাতি রাখার ঘরে, একটা সোফায় জনের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মেরী, হাত দুটো একটা মূর্তির ওপর।

ঈশ্বর, জন যা ভেবেছে তাই। মেরী ওর মনের কথা জেনে গেছে। ওর কাঁধ দুটো কাঁপছে। কাঁদছে মেরী। কাঁদছে স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জেনে। নাকি ও হাসছে? কাঁধ দুটো যেভাবে নড়ছে তাতে মেরী হাসতেও পারে। কিন্তু কাঁদুক আর হাসুক, যাই করুক, ওর অভিব্যক্তি দেখার সময় এখন জনের নেই। এরকম সুযোগ লাখে একটা মেলে। নিচু হয়ে আছে মেরী। ওর ঠিক মাথার ওপরের তাকে ভিক্টর হুগো, ফ্রাঙ্কলিন এদের বড় বড় সব মূর্তি। যে কোন একটা মূর্তিকে সামান্য ধাক্কা দিলেই ওটা সরাসরি মেরীর মাথায় পড়বে, চৌচির করে দেবে খুলি। শুধু সামান্য একটু ধাক্কা।

ধাক্কা দিল জন।

কত সহজ কাজ!

মেরী, বেচারী মেরী!

যাক্, এটাই সবচে' ভাল হলো। ডিভোর্সের জ্বালা আর সইতে হলো না তার স্ত্রীকে। কাজটা এত সহজে হবে ভাবেনি জন। সময়ই তো লাগল না। এত অনায়াসে কাজটা করা যাবে জানলে সে আরও আগে সুযোগটা নিত।

জন খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শেষবারের মত মেরীর দিকে

চেয়ে ডাইনিংরুমে চলে এল। কফিটা শেষ করে সে ডাক্তারের কাছে ফোন করবে। সন্দেহ নেই ডাক্তার পুলিসকে জানাবে মৃত্যুটা স্রেফ দুর্ঘটনা ছিল। জনকে একটু মিথ্যে বললেই হবে। বলবে মেরী মূর্তি নামাতে গিয়ে হাত পিছলে মাথা ফেটে মরেছে। বলবে মেরীকে সে এর আগেও সাবধান করে দিয়েছিল তাক থেকে ভারি মূর্তি নামানোর সময় যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। কিন্তু 'আমার কিছু হবে না' বলে মেরী তার কথার গুরুত্ব দেয়নি।

কফিটা এখনও গরম। তারিয়ে তারিয়ে ওটা পান করল জন। লেটিসের কথা ভাবছে সে। ওকে টেলিফোন করবে, জানাবে আর কোন সমস্যা নেই, এখন নিশ্চিন্তে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। লেটিসকে পরে জানালেও চলবে।

আনন্দিত হলেও উল্লসিত হলো না জন। শান্ত থাকল। নিজেকে খুব রিল্যাক্স লাগছে। কাজটা নির্বিঘ্নে করতে পারার আয়েশ আর কি। ঘুম পাচ্ছে ওর। ভীষণ ঘুম। লিভিংরুমের কাউচে গিয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ডাক্তারের কাছে পরে ফোন করলেও চলবে। কিন্তু কাউচে গিয়ে শোয়া হলো না জনের। ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল। হাত দুটো ঝুলতে থাকল টেবিলের পাশে।

*

করুণ ঘটনাটা কিভাবে ঘটল জন কিংবা মেরীর কোন বন্ধুই ঠিক ঠাহর করতে পারল না। ওদের মনে সামান্য সন্দেহ পর্যন্ত জাগল না। সবাই ধরে নিল মেরী কোন কারণে ওই ভারি মূর্তিগুলো নামাতে গিয়েছিল। হাত ফস্কে মূর্তি পড়ে যায় তার মাথায়, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে মেরীর। আর বাইরে থেকে জন এসে মৃতা মেরীকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। হয়তো জন ওইসময় সুস্থভাবে চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সে তৎক্ষণাৎ কফিতে ঘুমের ট্যাবলেট গুলে ওই কফি পান করে আত্মহত্যা করে।

জন আর মেরীর সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা স্মরণ করে সবাই আহা উঁহুঁ করতে লাগল। ওদের মনে পড়ল বিংশতি বিবাহবার্ষিকীতে এই সুখী দম্পতি তাদের মৃত্যু যেন একসঙ্গে হয় বলে সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিল। সত্যি, এযুগে এমন স্বামী-স্ত্রীর দেখা মেলা ভার। কি অসাধারণ ভালবাসা আর টান ছিল পরস্পরের প্রতি। আর এই তীব্র প্রেমই দু'জনকে টেনে নিয়েছে অমোঘ নিয়তির দিকে, দু'জনেই শেষযাত্রা করেছে অনন্তের উদ্দেশে একই রাতে, যেমনটি তারা চেয়েছিল।

***

নিয়তি

নিজের শরীরে আঙুল বোলাচ্ছে ফ্যাটস্টাফ। পরনের কাপড়টা মোটা, খসখসে এবং সস্তা মনে হলো। তার মানে এটা ওর পোশাক নয়।

'কেউ ভুল করেছে,' বিরক্ত গলায় বলল সে। 'এটা আমার পোশাক নয়।'

'তা ঠিক,' বলল নার্স। 'আপনার জামাকাপড় অ্যাক্সিডেন্টের সময় একদম ছিঁড়ে গিয়েছিল। তবে এই পোশাক দিয়ে বেশ কিছুদিন কাজ চালাতে পারবেন। এগুলো স্যালভেশন আর্মির কাপড় দিয়ে তৈরি।'

'আচ্ছা!' একটু নরম হলো ফ্যাটস্টাফ। 'তা আমার চোখ থেকে ব্যান্ডেজ কখন সরানো হবে শুনি?'

'ডাক্তার আসা মাত্র,' জানাল মেয়েটা। 'উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।'

'ভাল,' বলল সে। 'ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারব।'

হাসপাতালের বালিশে আবার মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল ফ্যাটস্টাফ। অ্যাক্সিডেন্টের কথা সব মনে পড়ছে। ওইদিন সকালে সে বার্থার বাড়ির পেছনের মাঠটা পেরিয়ে হন হন করে এগোচ্ছিল। মনে সাহস আনতে সকালবেলাতেই তিন পেগ মদ গিলেছিল ফ্যাটস্টাফ। তারপর চাঁদি ফাটানো রোদে বেরিয়ে পড়ে অমন দুর্বল শরীর নিয়েও।

মাঠের শেষ প্রান্তে, জঙ্গলের ধারে শুকনো কুয়োটার কাছে কোন ঝামেলা ছাড়াই পৌঁছে যায় সে। এখানেই সে কয়েক হপ্তা আগে টাকাটা লুকিয়ে রেখেছিল ঝালাই করা একটা বালতির মধ্যে। বালতিটা এখন শুকনো কুয়োর নিচে চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছে।

ফ্যাটস্টাফের হাতে একটা রশি বাঁধা হুক। রশিটাকে সে কুয়োর পাশের শশাগাছের মাথায় কষে বাঁধল। তারপর ঢিল দিতে শুরু করল। হুকসহ রশিটা আস্তে আস্তে নেমে গেল কুয়োর মধ্যে। ঠং করে একটা শব্দ হতেই ফ্যাটস্টাফ বুঝল হুকটা বালতির হ্যান্ডেলের সঙ্গে আটকে গেছে। এখন বালতিটাকে টেনে তুললেই সে ত্রিশ হাজার ডলারের মালিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কুয়োর দিকে ঝুঁকতেই মাথাটা বোঁ করে উঠল ফ্যাটস্টাফের। দুর্বল শরীর, তীব্র সূর্যতাপ আর মদের প্রভাব যেন একযোগে আক্রমণ চালাল ওর ওপর। দুনিয়া আঁধার হয়ে এল দ্রুত, অজ্ঞান হবার পূর্ব মুহূর্তে মাথায় তীব্র বেদনা অনুভব করল ফ্যাটস্টাফ। কুয়োর মুখে প্রচণ্ড বাড়ি খেয়েছে সে।

ক'টা বাজে এখন? নার্স মেয়েটাকে সময় জিজ্ঞেস করল ফ্যাটস্টাফ। 'বিকেল পাঁচটা,' বলল মেয়েটা। আঁতকে উঠল সে। তারমানে এখানে আসার পর ছয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সন্দেহ নেই বার্থা পোমরয় বাস স্টেশনের ওদিকে তার জন্য

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। হয়তো সন্দেহও করছে ফ্যাটস্টাফ টাকাটা নিয়ে কেটেই পড়ল কি না। আর বার্থা রেগে গিয়ে পুলিসে ফোন করলেই কম্ম সাবাড়। সোজা শ্রী ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে ফ্যাটস্টাফকে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে, বার্থা ধৈর্য হারাবার আগেই তাকে পোমরয় বাস স্টেশনে পৌছুতে হবে।

'আমি এখানে এলাম কি করে?' জানতে চাইল ফ্যাটস্টাফ।

'এক শিকারী ভদ্রলোক আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন,' বলল নার্স। 'আপনাকে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করেন। তারপর অনেক কষ্টে টেনে হিঁচড়ে তার গাড়িতে উঠিয়ে এই হাসপাতালে পৌছে দিয়েছেন। গাড়িতে ওঠানোর সময় আপনার জামা কাপড় সব ছিঁড়ে যায়।'

মনে মনে শিকারী ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিল ফ্যাটস্টাফ। গোটা ব্যাপারটা এখন তার আরও পরিষ্কার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে শুরুতেই কি করে সবকিছু ভজকট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু এখনও সময় আছে। টাকাটা এখনও ওখানেই আছে—অপেক্ষা করছে তার জন্য—শুধু তুলে নেয়ার অপেক্ষা।

প্রথম দিকে অবশ্য সবকিছু ঠিকঠাক মতই চলছিল। ফ্যাটস্টাফ নিউ ইয়র্কের রাস্তায় চুরি-চামারি করত। মাস কয়েক আগে, মফস্বল শহর অ্যাপলটনে সে ভরঘুরের মত ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে। শহরের বাইরে, পোস্ট রোড থেকে শ' গজ দূরের এক পরিত্যক্ত ফার্মহাউস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফ্যাটস্টাফের। কারণ রাতের বেলায় ভূতুড়ে বাড়িটাতে আলো জ্বলছিল। নক করতেই দরজা খুলে দিয়েছিল বার্থা। বিধবা মহিলা ওকে ভেতরে ডেকে বসায়, ডিনার খাওয়ায় এবং রাতটা ওখানেই কাটিয়ে যেতে বলে। ফ্যাটস্টাফের না করার কোন কারণ ছিল না।

জগৎসংসারে এই ঘুণে-ধরা, পোকায় খাওয়া ফার্মহাউস ছাড়া বার্থার আর কিছু নেই, কেউ নেই। রসিক ফ্যাটস্টাফকে তার ভাল লেগে গেল। ফ্যাটস্টাফও হপ্তাখানেক তার সান্নিধ্য গ্রহণ করল সানন্দে। তাকে খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলল মহিলা। তারপর তার গোপন কথাটি একদিন খুলে বলল। ফ্যাটস্টাফ জানল বার্থা এতদিন একজন যোগ্য পার্টনারের অপেক্ষায় ছিল। বিশ্বাসী, চটপটে এবং চতুর। ফ্যাটস্টাফকে তার খুব মনে ধরেছে। তার বিশ্বাস, এতদিন সে যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সেটার সদ্ব্যবহার করার সময় অবশেষে এসেছে।

কি সুযোগ? জানতে চাইল ফ্যাটস্টাফ। ব্যাখ্যা করল বার্থা। পোস্ট রোড থেকে সিকি মাইল দূরে, একটা গলি বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। গলির মাথায় একটাই মাত্র বাড়ি—ম্যাকলিন টুল কোম্পানি। প্রতি শুক্রবার, বিকেল তিনটার সময় বুড়ো ম্যাকলিন বার্থার বাড়ি পার হয়ে তার অফিসে যায় কোম্পানির সাপ্তাহিক বেতন নিয়ে। গাড়ি ড্রাইভ করে সে একাই। এদিকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই জেনেই হয়তো নিরস্ত্র চলাফেরা করে বুড়ো।

এখন ফ্যাটস্টাফের যা করণীয়, ব্যাখ্যা করল বার্থা। তিনটে বাজার আগেই তাকে ওই গলিমুখে পৌছাতে হবে এবং ম্যাকলিন বুড়োর গাড়ির শব্দ শোনামাত্র সে শুয়ে পড়বে রাস্তায়, যেন ভয়ানক আহত হয়েছে। ম্যাকলিন শুধু কোম্পানির

নির্বাহীই নয়, চার্চের একজন ধর্মযাজকও বটে। সুতরাং স্বভাবতই সে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে নেমে আসবে 'আহত' লোকটাকে সাহায্য করতে। আর ফ্যাটস্টাফ তখন সহজেই বার্থার ল্যুগার পিস্তল উঁচিয়ে, ম্যাকলিনের কাছ থেকে সাপ্তাহিক বেতনের টাকাটা কেড়ে নিতে পারবে। ওই সময় বার্থা পোস্ট রোড থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, রাস্তার ধারে লুকিয়ে থাকবে। বুড়ো ম্যাকলিনকে কুপোকাত করে ছিনতাই করা টাকাটা নিয়ে ফ্যাটস্টাফ সোজা চলে যাবে পোমরয় বাস স্টেশনে, টিকেট কেটে ভেগে পড়বে নিউ ইয়র্কে। বার্থাও আলাদা বাসে চড়ে নিউ ইয়র্কে, নির্দিষ্ট ঠিকানায় ফ্যাটস্টাফের সঙ্গে মিলিত হবে।

'সব খাপে খাপ মিলে যাবে। কোন ঝামেলাই হবে না,' বলেছিল বার্থা।

ফ্যাটস্টাফও প্ল্যানটা নানাভাবে উল্টেপাল্টে দেখে অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। নাহ, কোথাও কোন খুঁত নেই। ঝামেলা না হবারই কথা।

কিন্তু ঝামেলা হলো। বুড়ো ম্যাকলিন যে সঙ্গে বন্দুক রাখে তা কে জানত? ফলে পরিকল্পনা মাফিক কাজ এগোল না। গোলাগুলি হলো। তবে ফ্যাটস্টাফের ভাগ্য ভাল প্রথম গুলিটা করার সুযোগ সে-ই পায়।

নিথর ম্যাকলিনকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালাল ফ্যাটস্টাফ। আর এখানেই ভুলটা করল। যাবার আগে ওর পরীক্ষা করা উচিত ছিল বুড়ো সত্যি মরেছে কি না। কিন্তু টেনশনের চোটে অত পরীক্ষা করার সময় ছিল না ফ্যাটস্টাফের। এতদিন চুরি চামারি করেছে, খুন করার কথা কস্মিনকালেও ভাবেনি। এখন মার্ডার কেস পেছনে রেখে পোমরয়ে যাওয়াটা ঝুঁকি হয়ে যাবে মনে করে আপাতত লুকিয়ে থাকার জন্যে সে বার্থার ফার্মহাউজেই ফিরে এল।

টাকাটা গাপ করে দেয়ার চিন্তাটা তখন মাথায় খেলল ফ্যাটস্টাফের। শুকনো, পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে টাকা লুকালে বার্থা জীবনেও টের পাবে না। আর যতদিন সে টাকার কোন সন্ধান না পাচ্ছে ততদিন নিজের গরজেই ফ্যাটস্টাফকে সে তার বাড়িতে লুকিয়ে রাখবে।

কিন্তু ওইদিন রাতে রেডিওতে খবরটা শুনে অজ্ঞান হতে শুধু বাকি রাখল ফ্যাটস্টাফ। ম্যাকলিন মারা গেছে ঠিকই কিন্তু পুলিস তাকে রাস্তায় মারাত্মক আহত অবস্থায় আবিষ্কার করার পরে। মৃত্যুর আগে সে ফ্যাটস্টাফের কথা বলে গেছে। পুলিস রেডিওতে তার টেপ করা নিখুঁত বর্ণনা প্রচার করল, 'এত মোটা মানুষ জীবনেও দেখিনি আমি,' মৃত্যুপথযাত্রী ম্যাকলিনের শ্বাসটানা গলা ভেসে এল। 'পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। আলুর মত ফোলা গাল। ঊরু দুটো এত মোটা, প্যান্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। বিরাট ভুঁড়ি। ওকে আপনারা দেখলেই চিনতে পারবেন। অমন মোটা লোক সচরাচর চোখে পড়ে না।'

ফ্যাটস্টাফ এবং বার্থা দু'জনেই বুঝতে পারল এই চেহারা আর শরীর নিয়ে ফ্যাটস্টাফের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। খুদে এই মফস্বলের যে কেউ তাকে দেখামাত্র চিনে ফেলবে। এই সময় চট করে আইডিয়াটা মাথায় খেলল ফ্যাটস্টাফের। চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে থাকবে সে, খুব কম খাবে যাতে শিগগিরই মেদ ঝরে রোগা হয়ে ওঠে। তারপর সময় বুঝে একদিন এখান থেকে হাওয়া হয়ে যাবে।

চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করল ফ্যাটস্টাফ। দুই মাস ওখান থেকে এক পাও নড়ল না। বার্থা ওকে প্রতিদিন লেটুস, সর ছাড়া দুধ আর শরবতি লেবু ছাড়া অন্য কিছু খেতে দিল না। দুই মাস পর কুমড়োপটাশ ফ্যাটস্টাফ হাড়গিলেতে রূপান্তরিত হলো। যেন জ্যান্ত একটা কঙ্কাল। এখন সময় হয়েছে পালাবার, বুঝল সে। আর তারপরই লুকানো টাকা উদ্ধার করতে গিয়ে ঘটল অঘটন।

বিছানার একপাশে হেলান দিল ফ্যাটস্টাফ। আসলে কঠোর ডায়েটের পর প্রচণ্ড সূর্যতাপে দুর্বল শরীরে অত তড়িঘড়ি করে বেরুনো ঠিক হয়নি তার, ভাবল সে। আর মদ তার সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ করেছে। ইস্, মাথা ঘুরে কিভাবে সে পড়ে গিয়েছিল! কিন্তু বার্থা তো এসবের কিছুই জানে না। সে এতক্ষণে পোমরয়ের বাসের টিকেট কিনে ফ্যাটস্টাফের জন্যে অপেক্ষা করে নিশ্চয় রেগে বোম হয়ে উঠেছে—

নার্সকে জিজ্ঞেস করল ফ্যাটস্টাফ, 'এখান থেকে চলে যাবার সময় আমাকে কি কোন দস্তখত করতে হবে?'

'না,' বলল সে। 'আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর আপনার মানসিক অবস্থা—প্রবল উত্তেজনাটা অবশ্য সাময়িক ছিল! এই যে! ডাক্তার সাহেব এসে গেছেন!'

ফ্যাটস্টাফ বসা ছিল, ডাক্তারের কথা শুনে আবার টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কাঁধে কার যেন হাতের স্পর্শ পেল, ডাক্তারই হবেন, আন্তরিক সুরে বললেন, 'হ্যালো!'

ফ্যাটস্টাফ মোটা কাপড়ের ফুলপ্যান্টে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, 'ডাক্তার, আমাকে নতুন কাপড় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু পোশাকটা বড্ড টাইট লাগছে যে!'

'পোশাকটা আসলে ঠিকই আছে,' বললেন ডাক্তার। 'আপনি খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন।'

'দূর, কি বাজে বকছেন!' বিরক্ত হলো ফ্যাটস্টাফ। 'এই প্যান্ট তো একটা তাঁবুর মতই বড়।'

'তা বটে। কিন্তু আপনি যখন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন তখন তো শুকনো, লিকলিকে ছিলেন।'

'কিন্তু—সে তো আজ সকালেও ছিলাম। মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে—'

ডাক্তার ফ্যাটস্টাফের চোখের ব্যান্ডেজ খুলতে খুলতে বললেন, 'এখন কে বাজে বকছে, বলুন তো? আজ সতেরোই সেপ্টেম্বর। আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আগস্টের প্রথম হপ্তায়। এতদিন স্রেফ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। আঘাতটা এত ভয়ঙ্কর ছিল যে আপনাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাদের জান বেরিয়ে গেছে।'

ব্যান্ডেজ খুলে ফেলা হয়েছে। ফ্যাটস্টাফ ধীরে ধীরে সিধে হলো। দরজার পাশে এক মানুষ সমান লম্বা আয়নাটার দিকে এগোল। দাঁড়াল ওটার সামনে। বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল নিজের প্রতিকৃতির

দিকে।

আবার সে পরিণত হয়েছে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কুমড়োপটাশে। সেই আলু ফোলা গাল, বেঢপ কোমর, মোটা পেট। বরং এখন যেন আরও বেশি ফুলেছে সে। ফ্যাটস্টাফ জানে টাকা নিয়ে শহর ছেড়ে পালানো দূরে থাক, হাসপাতাল থেকে বাইরে পা দেয়ামাত্র পুলিস তাকে গ্রেফতার করবে।

পেছন থেকে জানতে চাইলেন ডাক্তার, 'আপনি যাবার জন্যে প্রস্তুত? এখন স্বচ্ছন্দে আপনি চলে যেতে পারেন, জানেনই তো!'

মুখ হাঁ হয়ে গেল ফ্যাটস্টাফের, গলা চিরে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার, 'না! না! না!...'

প্রতিহিংসা

আমার বন্ধু ফরটুনাটোর মত আমিও, অর্থাৎ মন্ট্রেসর জাতিতে ইতালিয়ান এবং অভিজাত পরিবারের সন্তান। ফরটুনাটোকে 'বন্ধু' বললাম কি? উঁহুঁ ভুল বলেছি। বরং ও আমার যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়েও নিকৃষ্ট, উদ্ধত এবং সব সময় সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে।

ফরটুনাটো অনেক ক্ষতি করেছে আমার। সব মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু যেদিন ও আমাকে অপমান করল, মাথায় জ্বলে উঠল আগুন। আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রতিজ্ঞা করলাম শোধ নেব। ভয়ঙ্কর শোধ।

না, অপমানিত হওয়ার পরেও ফরটুনাটোকে কোন গালমন্দ করিনি আমি, হুমকিও দেইনি। শুধু মনে মনে প্রতিশোধের এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা করেছি। ঠিক করেছি সুযোগ পেলেই ছোবল মারব। বুঝিয়ে দেব আমার প্রতিহিংসা কত ভয়ানক। ফরটুনাটো অবশ্য জানত ওর ওপর ভয়ানক রেগে আছি আমি। জানত সুযোগ পেলে অপমানের শোধ না নিয়ে ছাড়ব না। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি আমার প্রতিশোধের ধরণ এত নির্মম হবে।

অপমানে জর্জরিত আমি ফরটুনাটোকে দেখলেই শুধু হাসতাম। কিন্তু অন্তরে যে আমার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, হাসিটা যে নিতান্তই কৃত্রিম, হতভাগা সেটা বুঝতে পারত না বলে উৎকট উল্লাসে ভেতরে ভেতরে আমি তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছি।

ফরটুনাটোকে শহরের সবাই বেশ মান্যগণ্য করত, ভয়ও পেত অনেকেই। তবে তার একটা দিক ছিল খুবই দুর্বল। জ্ঞানের অস্বাভাবিক অহঙ্কার ছিল তার আর উৎকৃষ্ট মদ পেলে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবার ফুরসৎ থাকত না মোটেই।

মদ আমারও বেশ পেয়ারের জিনিস। আমাদের গ্রামের মদ তো গুণেমানে ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। আর ফরটুনাটোর মতই যখনই সুযোগ পেতাম সেরা মদে সাজাতাম আমার ভাঁড়ার ঘর। টাকাপয়সার অভাব নেই আমার। খুবই বড়লোকের সন্তান আমি। তাই ফরটুনাটোর সঙ্গে সম্পদ আর ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতায় কখনোই পিছিয়ে থাকিনি। আমার সেরা সম্পদ ছিল এই মদের বোতলগুলো। আমার সুরম্য অট্টালিকাসম বাড়ির সেলারে ওগুলো সাজিয়ে রাখতাম আমি।

একদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এলাম আমি। কার্নিভাল উৎসবের সময় ওটা। সবাই পেট পুরে খাচ্ছে, যার যত ইচ্ছে মদ ঢালছে গলায়। কারণ এর পরেই ছয় হপ্তা ধরে উপবাসের পালা শুরু হতে যাচ্ছে, চলবে সেই ইস্টারের আগ পর্যন্ত। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা সবাই, যেন পাগল হয়ে গেছে প্রত্যেকে। আর সবার মত ফরটুনাটোও রঙ ঝলমলে পোশাক পরে আছে। ওর পরনে বহুরঙা স্ট্রাইপের ভাঁড়ের পোশাক, মাথায় ঘণ্টা বাঁধা ডাবল টুপি।

আমাকে দেখে হাসল ফরটুনাটো, যেন খুব খুশি হয়েছে। সন্দেহ নেই প্রচুর

গিলেছে ব্যাটা। আমিও ওকে দেখে খুব খুশি হওয়ার ভান করে ওর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, 'মাই ডিয়ার ফরটুনাটো, তোমাকে আজকে যা চমৎকার লাগছে! শোনো, তোমার জন্যে দারুণ একটি খবর নিয়ে এসেছি। এই তো সেদিন বিশাল এক মদের ব্যারেল কিনলাম। বিক্রেতা বলল ওটা নাকি আমোন্টিলাডো। কিন্তু আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি ওর কথা।'

আমরা দু'জনেই জানি আমোন্টিলাডো খুব দামী মদ; শেরী, দক্ষিণ স্পেনের মন্টিলা শহরেই এটা শুধু তৈরি হয়।

'অসম্ভব!' বলল ফরটুনাটো। 'আমোন্টিলাডো? এই সময়ে?'

'বললামই তো আমার নিজেরও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল,' বললাম আমি। 'তোমার সঙ্গে আলাপ না করেই পুরো ব্যারেলের দাম চুকিয়ে দিয়ে বোধহয় ভুলই করেছি। কারণ জানি তো মদ চেনার বিষয়ে তুমি একজন এক্সপার্ট। কিন্তু ওই সময় তোমাকে না পেয়ে দামদরও আর করা হয়নি।'

'আমোন্টিলাডো!' বিড়বিড় করে বলল ফরটুনাটো। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

'সন্দেহ তো আমিও করেছি,' বললাম। বুঝতে পারছি ও আমার ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে। 'কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই আমি। তবে তুমি ব্যস্ত না থাকলে তোমাকেই জিনিসটা দেখাতাম আমি। এখন বাধ্য হয়ে লুচেসির কাছে যেতে হচ্ছে আমায়। অবশ্য মদের ব্যাপারে ভালমন্দের জ্ঞানটি ওরও বেশ টনটনে। ওই হয়তো আমাকে বলতে পারবে...।'

'লুচেসির কাছে আমোন্টিলাডো যা সাধারণ শেরীও তাই,' রেগে উঠল ফরটুনাটো, শিকার আরও কাছিয়ে আসছে ফাঁদের দিকে, বুঝতে পেরে খুশি লাগল আমার।

'কিন্তু লোকে তো বলে তোমার মতই নাকি সে মদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।' বললাম আমি।

'লোকে কিচ্ছু জানে না,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফরটুনাটো। 'চলো, আমিই যাব।'

এতক্ষণে ব্যাটা খপ্পরে পড়েছে। 'কোথায়?' যেন কিছুই জানি না, এভাবে জানতে চাইলাম আমি।

'তোমার মদের ভল্টে।'

'নো, মাই ফ্রেন্ড, নো। তোমার উৎসবের আনন্দটা আমি মাটি করতে চাই না। তুমি খুব ব্যস্ত। লুচেসি...।'

'আমি অত ব্যস্ত নই। চলো।'

'উঁহুঁ। ভল্টে ভয়ানক ড্যাম্প। তাছাড়া তোমার দেখছি খুব সর্দি লেগেছে।'

'তারপরও চলো। সর্দিতে কিচ্ছু হবে না। আমোন্টিলাডো! ব্যাটা নির্ঘাত তোমাকে ঠকিয়েছে। আর লুচেসির কথা ভুলে যাও। গর্দভটা জানেই না আমোন্টিলাডোর সঙ্গে সাধারণ শেরীর কি পার্থক্য।'

কথা বলতে বলতে আমার হাত ধরে রীতিমত টানাটানি শুরু করে দিল ফরটুনাটো। প্রায় ঠেলে নিয়ে চলল আমার বাড়ি অভিমুখে।

বাড়ি পৌঁছে দেখি চাকরবাকরদের টিকিটিও নেই। নির্ঘাত সবক'টা কার্নিভাল উৎসবের মজা মারতে গেছে। অথচ বাইরে যাবার আগে পইপই করে বলে গিয়েছিলাম আগামীকাল সকালের আগে ফিরব না আমি, কেউ যেন কোথাও না যায়। কিন্তু যেই বেরিয়ে পড়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ছুট লাগিয়েছে উৎসবের উদ্দেশে।

দেয়াল থেকে দুটো মশাল নিলাম আমি। একটা ফরচুনাটোকে দিয়ে অন্যটা হাতে নিয়ে আগে বাড়তে শুরু করলাম আমরা। অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে মদ রাখার ভল্টের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়ালাম। লম্বা, জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম নিচে। ফরচুনাটোকে বললাম আমাকে যেন সাবধানে অনুসরণ করে।

ফরচুনাটো টলতে টলতে এগোল, প্রতিটি পদক্ষেপে ওর টুপির সঙ্গে বাঁধা ঘণ্টাগুলো বেজে উঠল টুংটাং শব্দে। লম্বা, অন্ধকার প্যাসেজওয়ে দিয়ে নীরবে এগিয়ে চলেছি আমরা, ফরচুনাটো জিজ্ঞেস করল, 'আমোন্টিলাডো? কোথায়?'

'এই তো আরেকটু সামনে,' বললাম আমি।

অবশেষে আমরা প্যাসেজওয়েটার মাথায় এসে পৌঁছুলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম ড্যাম্প পড়া সেলারে। এই সেলার আসলে আমার পূর্বপুরুষ মনট্রেসরদের কবরখানা।

'দেখেছ কিরকম স্যাঁতসেঁতে দেয়াল,' বললাম আমি। খক খক করে কাশল ফরচুনাটো, কফ ফেলল। বেশি মদপানের কারণে ওর চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করেছে।

'কবে থেকে সর্দি বাঁধিয়েছ?' জানতে চাইলাম আমি।

এমন ভয়ানক কাশতে থাকল ফরচুনাটো যে অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

'এটা তেমন কোন ব্যাপার নয়,' বলল ও।

'শোনো,' দৃঢ় গলায় বললাম আমি। 'আমরা এখনই এখান থেকে চলে যাব। কারণ এত ঠাণ্ডায় যদি তোমার কিছু হয়ে যায় নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না আমি। তুমি ধনী, সম্মানিত এবং সবার প্রিয়পাত্র। এভাবে এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকলে তোমার শরীর নিশ্চই আরও খারাপ হবে। সেটা আমি হতে দিতে পারি না। আর লুচেসি যখন আছেই...।'

'রাখো তোমার লুচেসি!' চেঁচিয়ে উঠল ফরচুনাটো। ভাঙা শোনাল গলা। 'বললামই তো, এই সর্দিটা এমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এতে আমি মরে যাব না।'

'তা অবশ্য ঠিক,' বললাম আমি। 'তবুও একটু সতর্ক করে দিলাম আর কি। ঠিক আছে, তুমি যখন ছাড়বেই না তাহলে নাও এখান থেকে কয়েক ঢোক খেয়ে নাও। শরীরটা গরম থাকবে।'

সেলারে সাজানো এক সাইজের বোতলের লম্বা সারি থেকে একটা বোতল তুলে দিলাম আমি ফরচুনাটোর হাতে। 'খাও,' বললাম ওকে।

মুখের কাছে বোতলটা তুলে ধরল ফরচুনাটো, লোভে চকচক করছে চোখ। আমার দিকে ফিরে নড় করল ও, আবারও মিষ্টি শব্দে বেজে উঠল

'তোমার পূর্বপুরুষরা, যারা এখানে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে,' ঠোঁটে বোতলটা ছোঁয়াল ফরটুনাটো।

'আর আমি পান করছি তোমার দীর্ঘ জীবন,' বললাম আমি। তারপর একসঙ্গে মদপান করলাম আমরা।

'তোমাদের এই ভল্টগুলো,' বলল ও, 'খুবই বড়।'

'মনট্রেসররা,' বললাম আমি, 'বিশাল এক যৌথ পরিবারের লোক ছিলেন।'

'তোমাদের বংশমর্যাদার সূচক কি?'

'বিশাল পা, সোনালি রঙের, পেছনে নীল ব্যাকগ্রাউন্ড। পা-টাকে জড়িয়ে থাকে একটা সাপ, সাপটার বিষদাঁতগুলো পড়ে থাকে পায়ের পাতার নিচে।'

'আর তোমাদের বংশমর্যাদায় সূচকের আদর্শ-বাণী কি?'

'নেমো মি ইমপুন লাসেসিট! অর্থাৎ যে আমাকে আক্রমণ করবে সে সাবধানে থেকো!'

প্রচুর মদ পেটে যাওয়ার কারণে ফরটুনাটোর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, হাঁটার সঙ্গে বেজে উঠছে ঘণ্টা। ভল্টগুলোর একেবারে ভেতরের দিকে চলে এলাম আমরা। ভূ-গর্ভস্থ সমাধিস্তম্ভগুলো এখন আমাদের সামনে। মানুষের হাড়গোড় গাদা করে রাখা দেয়ালের সঙ্গে। আর আমার সবচেয়ে দামী মদের ভান্ডার ওগুলোর পাশেই। আমি মদের ব্যারেলগুলো এখানে রেখেছি কারণ জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা। নষ্ট হবে না আমার এত মূল্যবান সম্পদ।

এখানে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম, ফরটুনাটোর কনুই খামচে ধরলাম।

'স্যাঁতসেঁতে ভাবটা,' বললাম আমি, 'খেয়াল করেছ বেড়েই চলেছে! আমরা এখন ঠিক নদীর তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। দেখছ কঙ্কালগুলোর গা কেমন ভেজা ভেজা। চলো, চলো, না হলে তোমার সর্দি…।'

'বাদ দাও তো!' বলল ফরটুনাটো, 'চলতে থাকো। তার আগে এসো আরেকবার গলা ভিজিয়ে নিই।'

এক ঢোকে সে বোতলটা শূন্য করে ফেলল। ঝিকমিক করে উঠল চোখ দুটো।

'এখন চলো আমোন্টিলাডোর স্বাদ নিয়ে আসি,' চেঁচিয়ে বলল ফরটুনাটো।

'তবে তাই হোক,' বললাম আমি। একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। ও প্রায় ঝুলে যেতে লাগল আমার সঙ্গে।

নিচু খিলানের একটা প্যাসেজ ধরে চললাম আমরা। তারপর আবার নামতে শুরু করলাম নিচে। অবশেষে মাটির নিচের একটি কক্ষে এসে ঢুকলাম। বাতাস এখানে এত কম যে আমাদের মশালগুলো প্রায় নিভু নিভু হয়ে এল।

কক্ষটির শেষ মাথায় আরেকটি ছোট ঘর। ওটার তিন দিকের দেয়ালে মানুষের কঙ্কাল, গাদাটা গিয়ে ঠেকেছে দেয়ালে। কিন্তু চতুর্থদিকের দেয়ালের কঙ্কালগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝেতে। এদিকের দেয়ালটা ফাঁকা। আমরা ওটার ভেতরে একটি চোরকুঠুরী দেখতে পেলাম। হাত চারেক গভীর, আনুমানিক তিন হাত চওড়া, আর উঁচু হবে ছয়-সাত হাত। চোরকুঠুরীটা সম্ভবত মানুষের হাতে তৈরি, তবে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ জায়গাটার দুই

পাশে বিশাল দুই পাথুরে স্তম্ভ সেলারের ছাদে গিয়ে ঠেকেছে, ঠেক দিয়ে রাখছে ওটাকে।

চোরকুঠুরীর দেয়ালটা শক্ত, গ্রানিট পাথরের। দেয়ালের ওপরে দুটো লোহার স্টাপল ইংরেজি ইউ অক্ষরের মত, ফুট দুয়েক ব্যবধান দুটোর মাঝখানে। দুটোতেই দুটো লম্বা লোহার চেইন ঝুলছে, চেইন দুটোর মাথায় হ্যান্ডকাফের মত 'রিস্টলক'।

ফরটুনাটো তার প্রায় নিভন্ত মশালটা উঁচু করে ধরল, চোরকুঠুরীর গভীরতা কতখানি দেখতে চাইছে। কিন্তু কাজ হলো না। কারণ আলো খুবই কম।

'এখানে,' বললাম আমি। 'এখানেই সেই বিখ্যাত আমোন্টিলাডো এনে রেখেছি আমি। লুচেসি যদি এখন থাকত এখানে…'

'ওই গর্দভটার কথা আর মুখে এনো না!' বাধা দিল আমাকে ফরটুনাটো, টলমল পায়ে এগোল সামনের দিকে। ওকে তৎক্ষণাৎ অনুসরণ করলাম আমি। চোরকুঠুরীর দেয়ালের শেষ মাথায় যেন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে পৌঁছে গেল সে। কিন্তু দেয়ালে মুখ ঠেকে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হতভম্ব হয়ে।

মাত্র এক সেকেন্ড সময় লাগল আমার লোহার স্টাপল থেকে চেইনটা টেনে নামাতে, বিদ্যুৎগতিতে আমি চেইন দিয়ে ওর কোমর পেঁচালাম, হাত দুটো আটকে দিলাম লোহার হ্যান্ডকাফে। ফরটুনাটো এত মাতাল ছিল যে বাধাই দিতে পারল না। আমি গ্রানিটের দেয়ালটার সঙ্গে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললাম। হাত দুটো 'রিস্টলক'-এ বেঁধে, চাবিটা ফেলে দিয়ে পিছু হটে এলাম।

'হাত দুটো দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরো,' বললাম আমি। 'বুঝবে ঠাণ্ডা কাহাকে বলে। এখন নিজেকে মুক্ত করার জন্য চিৎকার করো, কাঁদো, আমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাও…চাইবে না? ঠিক আছে, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা মজা দেখিয়ে যাব।'

'আমোন্টিলাডো!' চিৎকার করে উঠল ফরটুনাটো। এখনও বিস্ময়ের ভাবটা কাটেনি ওর।

'ঠিক,' বললাম আমি। 'আমোন্টিলাডো।'

কথা বলতে বলতে আমি কাজ শুরু করে দিলাম। হাড়গোড়ের গাদাটাকে একপাশে সরিয়ে দালান তোলার পাথর আর সিমেন্ট বের করলাম ওখান থেকে। জিনিসগুলো আগেই এখানে রেখে গিয়েছিলাম আমি।

আমার লম্বা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলাম পলস্তারা লাগানোর বেলচা। তারপর চোরকুঠুরীর প্রবেশ পথের সামনে দেয়াল তুলতে শুরু করলাম।

পাথরের প্রথম স্তরটা সিমেন্ট মাখিয়ে খুব দ্রুত তুলে ফেললাম। কাজ করতে করতে টের পেলাম ফরটুনাটোর মাতলামি ভাবটা কেটে আসছে। গোঙানির মত একটা শব্দ শুনতে পেলাম—তবে ঠিক মাতালের কান্না নয়। তারপর শব্দটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। লম্বা নীরবতা নেমে এল। আমি দ্বিতীয় স্তরটা তুলে ফেললাম…তারপর তৃতীয়…এবং চতুর্থটি।

এই সময় ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল লোহার চেইন। অনেকক্ষণ ধরে বাজতেই থাকল। শব্দটা শোনার লোভে হাতের কাজ গুটিয়ে আমি হাড়ের গাদার ওপর

চুপচাপ বসে থাকলাম।

শব্দটা থামলে আবার কাজ শুরু করলাম। কোন রকম বাধা ছাড়াই পাথুরে দেয়ালের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্তর পর্যন্ত তুলে ফেললাম। দেয়ালটা এখন আমার প্রায় বুক সমান। কাজে একটু বিরতি দিলাম। মশালটা উঁচু করে ধরলাম যাতে আলোটা চোরকুঠুরীতে গিয়ে পড়ে।

তীক্ষ্ণ এবং তীব্র একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল ভেতর থেকে। এক মুহূর্তের জন্যে আমি কেঁপে উঠলাম, দোটানায় ভুগলাম কয়েক সেকেন্ড। ওর গলা কি বাইরের কেউ শুনতে পাবে? নাহ্, পরক্ষণে নাকচ করে দিলাম চিন্তাটা। সেরকম কোন চান্সই নেই। কঠিন গ্রানিটের দেয়ালে হাত রাখলাম আমি। সন্তুষ্টি বোধ করলাম মনে মনে।

আবারও চিৎকার করে উঠল ফরটুনাটো। গলা যেন ছিঁড়ে যেতে চাইল ওর, কিন্তু থামল না। আমিও পাল্টা চিৎকার করলাম, যেন ভেঙচি কাটলাম ওর চিৎকারের প্রত্যুত্তরে। আমার গলার জোরে ওর চিৎকার ডুবে গেল। থেমে গেল ফরটুনাটো।

আট, নয় এবং দশ নম্বর স্তরও তুলে ফেললাম আমি দ্রুত। ঘড়ির দিকে তাকালাম। মাঝরাত। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছি আমি। সর্বশেষ অর্থাৎ এগারোতম স্তরটাও এবার তুলে ফেললাম। এখন শুধু ছোট্ট একটি ফোকরের মত রইল, একটা পাথর বসিয়ে প্লাস্টার করে দিলেই হলো, ব্যস, দেয়ালটার কোথাও কোন ছিদ্র থাকবে না।

এই সময় চোরকুঠুরী থেকে ভেসে এল নিচু গলার হাসি। আমার ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। হাসতে হাসতে কথা বলল ফরটুনাটো, করুণ আর শীতল গলায়। বুঝতে কষ্ট হলো এটাই সেই চির উদ্ধত আর দুর্বিনীত বন্ধু ফরটুনাটোর কণ্ঠ।

'হা! হা! হা!—হি! হি!—দারুণ রসিকতা জানো, হে—দারুণ,' ফিসফিস করে বলল ও। 'এই ঘটনাটা নিয়ে আমরা পরে অনেক তামাশা করতে পারব, সত্যি! হি! হি! হি!'

'আমোন্টিলাডো!' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

'হি! হি! হি!—হ্যাঁ, আমোন্টিলাডো। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ওরা সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে—আমার বউ এবং অন্য সবাই। চলো, যাই।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'চলো যাই।'

'ঈশ্বরের দোহাই বলছি, মনট্রেসর!'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'ঈশ্বরের দোহাই বলছি।'

কিন্তু আমার কথার কোন জবাব এল না। অধৈর্য হয়ে উঠলাম আমি। জোরে ডাকলাম, 'ফরটুনাটো!'

কোন জবাব নেই।

আবারও ডাকলাম আমি, 'ফরটুনাটো!'

এবারও জবাব এল না। ছোট্ট ফোকরটা দিয়ে একটা মশাল ফেলে দিলাম আমি

চোরকুঠুরীর ভেতরে। শুধু ঘন্টার টিং টিং শব্দ ভেসে এল।

হঠাৎ বমি পেতে শুরু করল আমার, শরীর কেমন দুর্বল ঠেকল। এটা এই সেঁতসেঁতে পরিবেশটার জন্যে। আমি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলাম। শেষ পাথরটা বসালাম ফোকরে, প্লাস্টার দিয়ে লাগিয়ে দিলাম ওটা সদ্য নির্মিত দেয়ালের সঙ্গে। তারপর হাড়ের গাদাগুলো দিয়ে ঢেকে দিলাম দেয়ালটা।

গত অর্ধশতাব্দীতে এই কঙ্কালগুলোকে কেউ বিরক্ত করেনি। ওকেও কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। শান্তিতে বিশ্রাম নিতে দাও ওকে।

***

নেশা

প্রায় ষাট বছর ধরে মি. ম্যাকমাস্টার আমাজনের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করলেও অল্প কিছু সিরিয়ানা ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ তাঁর অস্তিত্বের কথা জানত না বললেই চলে। খুদে এক সাভানা অঞ্চলে তাঁর বাড়ি। বাড়ির সামনে এক চিলতে জমি। এখানে তিনি সব্জীর চাষ করেন। বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। ওদিকে মি. ম্যাকমাস্টার কদাচিৎ যান।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সরু একটি নদী সাপের মত এঁকে বেঁকে গেছে। এই নদীর অস্তিত্ব সম্ভবত কোন মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সরু হলেও নদীটির তেজ অসম্ভব। বছরের বেশির ভাগ সময় সে সারা গায়ে সাদা ফেনা তুলে সগর্জনে ছুটে চলে উরারিকুয়েরা নদীর সাথে মিলিত হতে। উরারিকুয়েরা নদীর কথা স্কুলের মানচিত্রগুলোতে উল্লেখ থাকলেও আজও এই নদী সম্পর্কে অনেক কিছুই অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

উরারিকুয়েরা নদী সম্পর্কে সভ্য জগতের মানুষের জ্ঞান যেমন ভাসাভাসা তেমনি মি. ম্যাকমাস্টার ছাড়া তাঁর প্রতিবেশীদের কেউ আজ পর্যন্ত কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল কিংবা বলিভিয়ার নামও শোনেনি।

প্রতিবেশীদের চেয়ে মি. ম্যাকমাস্টারের বাড়িটি একটু বড়। তবে দেখতে একইরকম। সেই তালপাতার ছাউনি দেয়া ছাদ, বুক পর্যন্ত উঁচু মাটির দেয়াল আর মাটির মেঝে। মি. ম্যাকমাস্টারের সম্পত্তি বলতে আছে ডজনখানেক বেঁটে সাইজের গরু, যাদের কাজ সামনের ছোট্ট মাঠটায় ঘাস খেয়ে আপন মনে চরে বেড়ানো, ক্যাসাডার (সাগুদানা) একটা ঝাড়, কিছু আম আর কলা গাছ, একটা কুকুর আর অজপাড়াগাঁয় অশিক্ষিত অধিবাসীদের মহা বিস্ময় এবং শ্রদ্ধার বস্তু একনলা একটি শর্টগান। এগুলো অনেক হাত ঘুরে অবশেষে তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে। এই মহার্ঘ্য বস্তুগুলো মি. ম্যাকমাস্টার যক্ষের ধনের মতই আগলে রাখেন।

একদিন সকালে মি. ম্যাকমাস্টার তার বন্দুকে কার্তুজ ঢোকাতে ব্যস্ত, এই সময় এক সিরিয়ানা ইন্ডিয়ান এসে খবর দিল সে একটি সাদা মানুষকে জঙ্গলের পথ ধরে এদিকে আসতে দেখেছে। লোকটি একা এবং দেখে মনে হয়েছে খুব অসুস্থ। মি. ম্যাকমাস্টার একটা কার্তুজ ঢুকিয়ে বাকিগুলো পকেটে রেখে বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিরিয়ানা লোকটা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

মি. ম্যাকমাস্টার জঙ্গলের কাছাকাছি চলে এসেছেন এই সময় সাদা মানুষটিকে তাঁর চোখে পড়ল। লোকটি মরার মত মাটিতে পড়ে আছে। তার জামা কাপড় শতচ্ছিন্ন, মাথায় টুপি নেই, জুতো ছাড়া দুটো পা-ই ক্ষতবিক্ষত। তার নগ্ন চামড়ায় পোকামাকড়ের কামড়ের দাগ স্পষ্ট, চোখ দুটো খোলা, উদভ্রান্ত। ভুল বকছিল সে এতক্ষণ, তবে মি. ম্যাকমাস্টারকে কাছে আসতে দেখে কথা বলে উঠল।

'আমি খুব ক্লান্ত,' নির্ভুল ইংরেজিতে বলল সে, 'আর পথ চলতে পারছি না। আমার নাম হেনটি। আমার সঙ্গী অ্যান্ডারসন মারা গেছেন। অনেক দিন আগে। আমার কথা শুনে আপনি হয়তো ভাবছেন আমি পাগলের মত প্রলাপ বকছি।'

'না, আমি তা ভাবছি না,' বললেন মি. ম্যাকমাস্টার, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব অসুস্থ।'

'না, অসুস্থ নই। ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত আমি। অনেকদিন কিছু খেতে পাইনি।'

মি. ম্যাকমাস্টার লোকটিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন, একটা হাত তুলে নিলেন নিজের কাঁধে, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের কুটিরের দিকে এগোলেন।

'এই তো সামনেই আমার বাড়ি। চলো, তোমাকে আমি খেতে দেব,' বললেন তিনি।

'সে আপনার দয়া,' বলল সে। 'আপনি বেশ সুন্দর ইংরেজি বলেন, আমিও আপনার মতই একজন ইংরেজ। আমার নাম হেনটি।'

'ঠিক আছে, মি. হেনটি। আর চিন্তার কিছু নেই। বুঝতেই পারছি পথ ভ্রমণে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তবে ভেব না, আমি তোমার যত্ন নেব।'

খুব ধীরে হেনটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন মি. ম্যাকমাস্টার। দোলনায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে শুয়ে থাকো, দেখি তোমার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

মি. ম্যাকমাস্টার পেছনের একটা ঘরে ঢুকলেন। কতগুলো চামড়ার গাদার নিচ থেকে একটা টিন বের করলেন। গাছের শুকনো পাতা আর ছালে টিনটা বোঝাই। তিনি একমুঠো পাতা আর ছাল তুলে নিয়ে বাইরে গেলেন। কয়েক মিনিট পর একটা লাউয়ের খোল হাতে করে ফিরে এলেন। ছাল আর পাতা দিয়ে তিনি হেনটির জন্যে একটা পানীয় তৈরি করেছেন। হেনটির মাথা উঁচু করে ধরলেন মি. ম্যাকমাস্টার, পানীয়টুকু তার মুখে ঢেলে দিলেন। তেতো, কষা স্বাদটার জন্যে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল হেনটির, কিন্তু মি. ম্যাকমাস্টার তাকে জোর করে জিনিসটা খাওয়ালেন। খাওয়া শেষ হলে খোলটা ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। হেনটি দোলনায় মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ শিশুর মত কাঁদল। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রফেসর অ্যান্ডারসনকে সবাই দুর্ভাগা বলেই জানত। কারণ ভদ্রলোক এ পর্যন্ত ব্রাজিলের গহীন অঞ্চলে অভিযানের জন্যে যতবার পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রত্যেকবারই কোন না কোন কারণে ব্যর্থ হয়েছেন। আর হেনটির দুর্ভাগ্য সে এই হতভাগ্য লোকটির সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে।

পল হেনটি প্রফেসর অ্যান্ডারসনের মত আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠার লোক নয়। সুদর্শন হেনটি ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, অনেক দেশ ঘুরেছে, তবে আবিষ্কারের নেশায় নয়, ব্যবসায়িক কাজে। হেনটির প্রচুর পয়সা আছে, তাকে সবাই খুব পছন্দ করে। সুন্দরী বিদূষী বউকে নিয়ে সুখের সংসারই ছিল হেনটির। কিন্তু বিয়ের আট বছর পর সংসারে অশান্তির আগুন লাগল। হেনটি জানল তার প্রিয়তমা এক টেনিস খেলোয়াড়ের সাথে ঢলাঢলি শুরু করেছে। তার কিছুদিন পর মেয়েটা ঝুঁকে পড়ে

কোল্ডস্ট্রিম গার্ডস-এর এক ক্যাপ্টেনের দিকে। এবার ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।

হেনটি যখন ঘটনাটা জানতে পারে ভয়ানক শক খায় সে। তারপর থেকেই বউ-র কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে শুরু করে। একা বাইরে যায়, ডিনার করে। চারটে ক্লাবের সদস্য ছিল হেনটি। এর মধ্যে তিনটি ক্লাবের ধারে কাছেও সে যেত না। কারণ ওই ক্লাবগুলোতে তার বউ-র প্রেমিকের সাথে দেখা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। বাকি ক্লাবটাতেই সে শুধু যেত। বিভিন্ন পেশার মানুষের ভিড়ে সরগরম থাকত এই ক্লাব। আর এখানেই প্রফেসর অ্যান্ডারসনের সাথে তার পরিচয়।

প্রফেসর অ্যান্ডারসন তখন ব্রাজিলে নব উদ্যমে অভিযান করতে যাচ্ছেন। তিনি হেনটিকে তাদের সাথে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। হেনটি জানতে চাইল এই অভিযানে আর কে কে আছেন। প্রফেসর অ্যান্ডারসন বললেন তিনি ছাড়াও দলে আছেন নৃতত্ত্ববিদ ড. সিমনস, জীববিজ্ঞানী মি. নেকার, জরিপকারী মি. ব্রাউ, অয়ারলেস অপারেটর এবং মেকানিক—ব্যস। অভিযানের জন্য সব রকম প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল, কিন্তু বারোশো পাউন্ডের অভাবে পুরো ব্যাপারটাই এখন ভেস্তে যেতে বসেছে।

হেনটি যখন জানল অভিযান শেষ হতে প্রায় এক বছর লেগে যাবে, উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। পয়সাওয়ালা হেনটির কাছে বারোশো পাউন্ড কোন ব্যাপারই না। টাকাটা সে প্রফেসর অ্যান্ডারসনকে দেবে ঠিক করল। এই অভিযানে অংশ নিতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জানাল হেনটি। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর কাছে ঘোষণা করল সে, 'আমি একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

'কী ডার্লিং?' জানতে চাইল বউ।

'তুমি তো আর আমাকে ভালবাস না, তাই না?'

'কী যে বলো, ডার্লিং! তুমি জানো আমি তোমাকে কত শ্রদ্ধা করি।'

'কিন্তু আমি জানি তুমি টনি না কী যেন নাম ওই ক্যাপ্টেনটাকেই বেশি ভালবাস, ভুল বললাম?'

'ঠিক, হেনটি, ওকেই আমি বেশি ভালবাসি। সে সত্যি সবার থেকে আলাদা।'

'চমৎকার! যাকগে, আমি এখনই ডিভোর্স নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছি না। তোমাকে বছর খানেক সময় দিচ্ছি, ভেবে দেখো কী করবে। আমি আগামী সপ্তায় উরারিকুয়েরার উদ্দেশে যাত্রা করব।'

'ও বাবা, সেটা আবার কোথায়?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে ব্রাজিলের কোথাও হবে বোধহয়। নদীটার অনেক কিছু এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আমরা সেই অনাবিষ্কৃত জিনিসগুলো আবিষ্কার করতে যাচ্ছি। আমাকে সম্ভবত বছরখানেক বাইরে কাটাতে হবে।'

'কিন্তু ডার্লিং, তোমাদের এই আবিষ্কার টাবিষ্কারের ব্যাপারটা খুব সাধারণ হয়ে গেল না? এই যে, বইতে যেমন লেখা থাকে একদল লোক অমুক কিছু আবিষ্কারের নেশায় বেরিয়ে পড়ল ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তো এতে ইন্টারেস্টিং কিছু দেখছি না।'

'তোমার অবশ্য দেখার কথাও নয়। কারণ আমি নিজেই তো তোমার কাছে

বৈচিত্র্যহীন, খুব সাধারণ একটা মানুষ।'

'রাগ করলে, পল? আমি তো রাগের কিছু—এই যা ফোন বাজছে। বোধহয় টনি ফোন করেছে। ওর সাথে একটু কথা বললে তুমি কি খুব বেশি মাইন্ড করবে, ডার্লিং?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ছুটল তার প্রেমিকের সাথে কথা বলতে। হেনটি শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অভিযান শুরুর কয়েক দিন আগে থেকেই হেনটির বউ তার স্বামীর প্রতি রীতিমত সদয় ব্যবহার শুরু করল। হেনটিকে নিয়ে সে দোকানে গেল, নিজের হাতে তার প্রয়োজনীয় সব জিনিস পত্র কিনে দিল। যাত্রার আগেরদিন সন্ধ্যায় সে হেনটির সম্মানে এমব্যাসিতে একটা পার্টি দিল। বলল হেনটি ইচ্ছে করলে তার যে কোন বন্ধুকে দাওয়াত করতে পারে। প্রফেসর অ্যান্ডারসন ছাড়া অন্য কারও কথা মনে পড়ল না হেনটির। প্রফেসর অ্যান্ডারসন অদ্ভুত পোশাক পরে পার্টিতে এলেন, বিরামহীনভাবে নাচলেন আর প্রতিবারেই নাচতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেললেন। পরদিন হেনটির বউ এল স্টেশনে স্বামীকে বিদায় জানাতে। হালকা নীল রঙের অত্যন্ত দামী একটা কম্বল উপহার দিল সে হেনটিকে। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে স্বামীকে চুমু খেল সে। বলল, 'যেখানেই যাও, শরীরের ঠিকমত যত্ন নিয়ো কিন্তু।'

হেনটিদের যাত্রার শুরুতেই দুটি বিঘ্ন ঘটল। সাউদাম্পটন থেকে অভিযাত্রীদের সবার জাহাজে ওঠার কথা, কিন্তু মি. ব্রাউ জাহাজে ওঠার আগে, গ্যাঙওয়েতে পুলিসের হাতে গ্রেফতার হলেন। তাঁর অপরাধ তিনি এক লোকের কাছ থেকে বত্রিশ পাউন্ড ধার করেছিলেন কিন্তু ঋণ শোধ না করেই ভেগে যাচ্ছিলেন। যাহোক, হেনটি নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে মি. ব্রাউকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া কারও কাছেই সহজ বলে মনে হলো না। মি. নেকারের মা তার ছেলের সাথে জাহাজে এসেছিলেন। তিনি জিদ ধরলেন ছেলের সাথে তাঁকেও এই অভিযানে নিয়ে যেতে হবে। কারণ তিনি সম্প্রতি এক পত্রিকায় ব্রাজিলের গহীন অরণ্যের যে সব ভয়ঙ্কর কাণ্ড কারখানার কথা পড়েছেন, তাতে একমাত্র ছেলেকে ওই নরকে একলা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হয় তাকে সাথে নিতে হবে, নয়তো ছেলেকে তিনি কিছুতেই যেতে দেবেন না। মি. নেকারের মায়ের সাথে এই নিয়ে অভিযাত্রীদের প্রচুর তর্কাতর্কি হলো। কিন্তু ভদ্র মহিলার এক গোঁ তিনি তার ছেলেকে কিছুতেই একা ছাড়বেন না। এদিকে জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। অভিযাত্রীরা সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। ভদ্র মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে বিজয়িনীর হাসি হেসে জাহাজ থেকে নেমে বাড়ির পথ ধরলেন। জীববিজ্ঞানীকে ছাড়াই প্রফেসর অ্যান্ডারসনের অভিযান শুরু করতে হলো।

প্রফেসর অ্যান্ডারসনরা যে জাহাজে উঠেছিলেন সেটা একটা ক্রুইজিং লাইনার, বিরামহীন তার যাত্রা পথ। সপ্তাহ খানেক না যেতেই মি. ব্রাউ অভিযোগ করতে শুরু করলেন জাহাজের দুলুনি তিনি মোটেই সহ্য করতে পারছেন না। ভয়ানক অসুস্থ

বোধ করছেন, এই অভিযানে অংশ নিয়ে সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করার তাঁর কোন ইচ্ছে নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎই তিনি তার প্রেমিকার সাথে এনগেজমেন্টের কথা স্মরণ করে রীতিমত কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। জাহাজ মানাউসে পৌছুলে মি. ব্রাউ ফেরার ভাড়াটা হেনটির কাছ থেকে আদায় করে তড়িঘড়ি জাহাজ থেকে নেমে পড়লেন। আরেকটা জাহাজে করে তিনি সাউদাম্পটন ফিরেই তাঁর প্রেমিকাকে বিয়ে করে ফেললেন।

ব্রাজিলে পৌছার পর অভিযাত্রীরা আরেকটা ধাক্কা খেল। যে সব অফিসারের সাথে প্রফেসর অ্যান্ডারসন অনেক আগে তার ব্রাজিল অভিযানের বিষয়ে কথা বলেছিলেন এবং তাঁরা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, সেই সব অফিসারের কারোই এখন চাকুরি নেই। হেনটি এবং প্রফেসর অ্যান্ডারসন যখন নতুন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলছেন, তখন ড. সিমনস তার বোঁচকা-বুচকি নিয়ে সোজা ভিস্তা নদীর দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। এখানে পৌছেই তিনি একটা বেসক্যাম্প তৈরি করে ফেললেন। অবৈধভাবে নদী তীরে ক্যাম্প তৈরির অপরাধে সৈন্যরা ড. সিমনসকে গ্রেফতার করল। হাজতে তাঁর কপালে কিছু উত্তম-মধ্যমও জুটল। পরে অবশ্য তিনি ছাড়াও পেলেন। কিন্তু সৈনিকদের ব্যবহারে তিনি এত বেশি রেগে গিয়েছিলেন যে অভিযানের তোয়াক্কা না করে তখুনি মানাউস চলে গেলেন এবং রিও ডি জেনিরোর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন। আর এই মামলা নিয়ে ড. সিমনস এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে অভিযানের কথা তাঁর আর মনেই থাকল না।

এদিকে প্রফেসর অ্যান্ডারসন আর পল হেনটি মিলে তাদের অভিযান শুরু করেছেন। মাসখানেকের মধ্যে তাদের রসদ গেল ফুরিয়ে। মহা ফ্যাসাদে পড়ল তারা। বারবার ফিরে যেতে মন চাইল, মেডিরা অথবা টেনেরিফে মাস ছয়েক লুকিয়ে থাকার কথাও ভাবলেন। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিতে হলো চিন্তাটা। কারণ লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করার আগে পত্রিকার সাংবাদিকরা তাদের ব্যাপারটা নিয়ে এত পাবলিসিটি করেছে যে কারও আর জানতে বাকি নেই প্রফেসর অ্যান্ডারসন তার দলবল নিয়ে ব্রাজিলের বিপদসঙ্কুল অরণ্যে উরারিকুয়েরা নদীর উৎসমুখ খুঁজতে বেরিয়েছেন। সুতরাং কোথাও ঘাপটি মেরে থাকারও সুযোগ নেই। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে দুজনকে অব্যাহত রাখতে হলো অভিযান।

প্রায় মাস দুয়েক ওরা দুজন ব্রাজিলের সবুজ, স্যাঁতসেঁতে অরণ্যে ঘুরে বেড়ালেন। নগ্ন, মানব-বিদ্বেষী ইন্ডিয়ানদের ছবি তুললেন, কয়েকটা সাপ ধরে বোতলে পুরলেন। কিন্তু স্রোতে ক্যানো উল্টে এগুলো আবার হারালেন। জঙ্গলের হাবিজাবি খাবার খেয়ে দুজনের পেট নেমে গেল, নেটিভ ইন্ডিয়ানদের গ্রামে আনন্দোৎসবে মদ খেয়ে বমি করে ভাসিয়ে দিলেন। গিয়ানিজ যে গাইডটা ওদের এতদিন পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছিল সে ব্যাটা একদিন সুযোগ বুঝে তার মালপত্র নিয়ে চম্পট দিল। আর মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত প্রফেসর অ্যান্ডারসন হঠাৎ একদিন মারাত্মক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। দিন কয়েক ভুগে, অস্পষ্ট প্রলাপ বকে, বেচারি হেনটিকে মাকু সম্প্রদায়ের কয়েকজন মাঝি—যাদের ভাষার

মাথামুণ্ডু কিছুই সে বোঝে না, তাদের মধ্যে রেখে প্রফেসর অ্যান্ডারসন পটল তুললেন। মাকু মাঝিরা এরপর তাদের কোর্স বদলে উল্টো দিকে নৌকা চালাতে শুরু করল। হেনটির অনুমতির ধারও ধারল না। হেনটি বেচারি অসহায়ের মত চুপচাপ বসে রইল নৌকার মাঝখানে।

প্রফেসর অ্যান্ডারসনের মৃত্যুর হপ্তাখানেক পরে, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হেনটি দেখল তার মাঝিরা অদৃশ্য, সেই সাথে নৌকাগুলোও। এ গহীন বনে, যেখান থেকে সভ্য জগতের দূরত্ব দুই তিনশো মাইলেরও বেশি, সেখানে একটি মাত্র দোলনা আর কয়েকটা জামা কাপড় সম্বল করে পল হেনটি হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল। কিন্তু বসে থেকে লাভ নেই বুঝতে পেরে সে আবার যাত্রা শুরু করল। এগোল নদীতীর ধরে। আশা যদি কোন নৌকা চোখে পড়ে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। হঠাৎ হেনটির মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেল। সে একবার থপথপ করে হাঁটে, আবার দৌড় দেয়, কখনও পানিতে নেমে স্রোত ঠেলে এগোতে থাকে।

হেনটির ধারণা ছিল জঙ্গলে সাপখোপ, বুনো জংলী কিংবা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের ভয় থাকলেও খাবারের বুঝি কোন অভাব হবে না। এখানে কেউ না খেয়ে মরে না। কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ উল্টো দেখে ভয়ে ওর আত্মা উড়ে গেল। নিবিড় এই জঙ্গল ছেয়ে আছে বিশাল সব গাছে, তাদের মোটা মোটা গুঁড়ি, শেকড় ছড়িয়ে আছে পাইথনের মত, কাঁটা ঝোপ আর আঙ্গুর লতারা জড়াজড়ি করে আছে। কোনখান থেকেই সামান্য খাবার সংগ্রহের বিন্দুমাত্র আশা নেই। অনাহারের প্রথম দিনটি ভয়ানক কষ্টে কাটল হেনটির। তারপর তার অনুভূতি শক্তি লোপ পেয়ে গেল। মনে হলো জঙ্গলের অধিবাসীরা তাকে দেখতে এসেছে। তবে খালি হাতে আসেনি, খাবারের ঝুড়ি হাতে করে এসেছে। নিতান্তই নিষ্ঠুরের মত তারা খাবারের ঝুড়ি উল্টে দিল। জ্যান্ত বড় বড় কয়েকটা কচ্ছপ বেরিয়ে এল ওগুলো থেকে। কেমন বাঁকা হেসে লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। লন্ডনে, যে সব লোকের সাথে হেনটির পরিচয় ছিল, তাদেরকেও সে দেখতে পেল। হেনটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে তারা উপহাস করতে লাগল। অনেক প্রশ্ন করল। কিন্তু হেনটি একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারল না। হেনটি তার বউকেও আসতে দেখল। তাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। বউ হেনটিকে জানাল ওই ক্যাপ্টেনের সাথে তার আর বনিবনা হচ্ছে না, তাই সে তাকে ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু বউ-র সাথে ভাল করে দুটো কথা বলার আগেই সেও অন্যদের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেনটির ভেতরে কে যেন বলল তাকে মানাউস পৌঁছতে হবে। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করল সে, বন জঙ্গল ঠেলে সামনের দিকে এগুতে শুরু করল। 'আমাকে কিছুতেই থেমে থাকলে চলবে না,' প্রতিজ্ঞা করল হেনটি। কিন্তু কিছুদূর এগোবার পরই দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এল, লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে। তারপর কী ঘটেছে কিছুই মনে নেই হেনটির। মি. ম্যাকমাস্টারের বাড়িতে দোলনায় শুয়ে আছে দেখে খুবই অবাক হলো। এখানে কিভাবে এল জানতে চাইল সে। মি. ম্যাকমাস্টার সংক্ষেপে ওকে ঘটনাটা বললেন। খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করল হেনটি এই বুড়ো লোকটার প্রতি।

ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল পল হেনটি। প্রথম দিকে সে মনের ঘোরে প্রলাপ

বকল, তারপর তার তাপমাত্রা কমে যেতে লাগল, শেষ পর্যন্ত বোধশক্তি ফিরে পেতে শুরু করল। মি. ম্যাকমাস্টার ওকে নিয়মিত সেই পাঁচন খাইয়ে যেতে লাগলেন।

'জিনিসটার স্বাদ খুবই বাজে,' মুখ বিকৃত করে বলল হেনটি, 'তবে সুস্থ বোধ করছি।'

'জঙ্গলে সব রকম অসুখের জন্যেই ওষুধ পাওয়া যায়,' বললেন মি. ম্যাকমাস্টার, 'এমন ভেষজ ওষুধ আছে যা খেলে তুমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে যেতে পারো। আমার মা ছিলেন একজন ইন্ডিয়ান। তিনি আমাকে এসব গাছ গাছড়ার উপকারিতা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। এছাড়াও আমার ইন্ডিয়ান বউদের কাছ থেকে আমি বিভিন্ন সময়ে প্রচুর প্রাকৃতিক ওষুধের গুণ শিখেছি। এমন কিছু গাছ আছে যার রস খেলে তুমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। আবার অন্য আরেকটি গাছের রস খেয়ে তুমি পাগল হয়ে এমনকি মারাও যেতে পারো। কিছু গাছ আছে যা তোমার সাথে থাকলে সাপের বংশও তোমার ধারে কাছে আসবে না। আবার এক ধরনের গাছ আছে যা পানিতে ডুবিয়ে রেখে ফল পাড়ার মত তুমি টপাটপ মাছ ধরতে পারবে। আরও অনেক ওষুধের কথা আমি শুনেছি। তবে চোখে দেখিনি। ওরা বলে এক ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে পচা গলা লাশকেও নাকি জীবিত করা যায়। অবশ্য এটাও আমার শোনা কথা। চাক্ষুষ কিছু দেখিনি।'

'আপনার কথা শুনে মনে হয়…আপনি ইংরেজ।' জানতে চাইল হেনটি।

'আমার বাবা ছিলেন বার্বাডিয়ান। ধর্মপ্রচারক হিসেবে তিনি ব্রিটিশ গায়ানাতে এসেছিলেন। তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ নারীকে বিয়ে করেন। পরে তাকে ছেড়ে দিয়ে সোনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এরপর তিনি আমার মাকে বিয়ে করেন। সিরিয়ানা মেয়েরা দেখতে কুৎসিত হলেও এরা ভীষণ পতিপরায়ণ। আমার অনেকগুলো বউ ছিল। এ এলাকার বেশির ভাগ ছেলে মেয়ের বাপ আমি। এই জন্য ওরা আমাকে মানে। আর ভয় করে আমার বন্দুক আছে বলে। আমার বাবা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। মাত্র বিশ বছর আগে তিনি মারা গিয়েছেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন, শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তুমি পড়তে জানো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'পড়াশুনা করার ভাগ্য সবার হয় না। যেমন আমি।'

হেনটি মি. ম্যাকমাস্টারকে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল। 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনি এখানে লেখাপড়া করার তেমন সুযোগ পাননি।'

'তা ঠিক। তেমন সুযোগ থাকলে কী আর পড়াশোনা করতাম না। জানো, আমার অনেক বই আছে। তুমি আরেকটু সুস্থ হও তারপর তোমাকে বইগুলো দেখাব। পাঁচ বছর আগে একটি ইংরেজের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। লোকটি নিগ্রো। তবে সে শিক্ষিত ছিল। জর্জ টাউনে তার বাড়ি ছিল। মারা গেছে সে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে আমাকে বই পড়ে শুনিয়েছে। তুমি ভাল হয়ে উঠে আমাকে বই পড়ে শোনাবে?'

'অবশ্যই শোনাব।'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে বই পড়ে শোনাবে।' মি. ম্যাকমাস্টার কথাটা বলে অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালেন।

হেনটি এখন অনেকটা আরোগ্যের পথে। সারাদিন সে দোলনায় শুয়ে তালপাতার ছাউনি দেয়া ছাদের দিকে চেয়ে তার স্ত্রীর কথা ভাবে, তাদের হারিয়ে যাওয়া সুখের দিনগুলোকে রোমন্থন করে, স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমের কথা ভেবে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরে। মি. ম্যাকমাস্টারের চালচলন তার কাছে কেমন যান্ত্রিক মনে হয়। সূর্যডোবার সাথে সাথে তিনি ঘরে ফেরেন, খেয়ে-দেয়ে গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে শুয়ে পড়েন। পরদিন ভোর হওয়ার সাথে সাথে আবার বেরিয়ে যান।

যেদিন প্রথম হেনটি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুল মি. ম্যাকমাস্টার তাকে নিয়ে তাঁর সব্জী বাগানের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে এলেন।

'সেই নিগ্রো লোকটির কবরটা তোমাকে দেখাব। এসো আমার সাথে।' মি. ম্যাকমাস্টার হেনটিকে কতগুলো আমগাছের মধ্যে একটা মাটির ঢিবির কাছে নিয়ে এলেন।

'আমার প্রতি লোকটি খুব সদয় ছিল। মৃত্যুর আগে প্রতিদিন বিকেলে সে আমাকে দুই ঘণ্টা করে বই পড়ে শোনাত। আমি ঠিক করেছি এখানে একটি ক্রস বসাব। তার মৃত্যু এবং তোমার আগমনকে স্মরণ করে। আইডিয়াটা দারুণ, না? আচ্ছা, তুমি কী ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'আমি আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে তেমন করে কখনও ভাবিনি।'

'ঠিক বলেছ। আমি অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক ভেবেছি কিন্তু এখনও ঠিক জানি না—তবে ডিকেন্স বিশ্বাস করতেন।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'ঠিক ঠিক। তাঁর বইগুলোতেই তুমি এর প্রমাণ পাবে।'

সেদিন বিকেলেই মি. ম্যাকমাস্টার নিগ্রোর কবরে ক্রস বসানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাঠ দিয়ে চমৎকার একটা ক্রস তৈরি করলেন তিনি। জিনিসটা দেখতে এত সুন্দর, মনে হলো ধাতুর তৈরি।

বিছানা ছেড়ে ওঠার পাঁচ ছয়দিন পরেও হেনটির আর জ্বর আসছে না দেখে মি ম্যাকমাস্টার বললেন, 'এখন তোমাকে আমার বইগুলো দেখানো চলে।'

ঘরের এক কোণায়, ছাদের সংলগ্ন চিলেকোঠার মত একটা জায়গা, সেখানে মি. ম্যাকমাস্টার একটা মই দাঁড় করিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। হেনটি নিচে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। মি. ম্যাকমাস্টার চিলেকোঠার প্ল্যাটফর্মে উঠে বসলেন হেনটি লক্ষ করল ওখানে অসংখ্য ছোট ছোট বান্ডিল স্তূপ করে রাখা। প্রতিটি বান্ডিলে কম্বল, তালপাতা আর চামড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

'পোকামাকড় আর পিঁপড়েদের হাত থেকে বই রক্ষা করা খুবই কঠিন ব্যাপার।' মি. ম্যাকমাস্টার বললেন, 'দুটো বই তো ওরা খেয়ে একেবারে শেষ করে ফেলেছে। ভাগ্যিস বাকিগুলোতে ইন্ডিয়ানদের বিশেষ একটা তেল মাখিয়ে রেখেছিলাম। নইলে এগুলোও যেত।'

বইয়ের একটা বান্ডিল নিয়ে নিচে নেমে এলেন মি. ম্যাকমাস্টার। বান্ডিলটা গরুর চামড়া দিয়ে মোড়া। চামড়া খুলতেই একটা বই বেরিয়ে এল। হেনটি বইয়ের নামটা পড়ল। 'ব্লিক হাউস'। প্রথম আমেরিকান সংস্করণ।

'যে কোন একটা বই দিয়ে শুরু করলেই হলো, বুঝলে?'

'ডিকেন্স বুঝি আপনার খুব প্রিয় লেখক?'

'কেন নয়, একশোবার। শুধু প্রিয় কেন, তার চেয়েও বেশি। আর তাছাড়া আমি শুধু এই বইগুলোর কথাই জানি। আমার বাবা প্রথমে এই বইগুলো পড়ে শোনাতেন, তারপর সেই নিগ্রো লোকটি—আর এখন থেকে তুমি শোনাবে। বহুবার এই গল্পগুলো শুনেছি, কিন্তু শুনতে গিয়ে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিনি, খারাপ লাগেনি। যতবার শুনেছি ততবার মনে হয়েছে নতুন কিছু শিখছি। কত ঘটনা, কত চরিত্র, কত দৃশ্য, কত শব্দ… পিঁপড়েরা যে বই দুটো ধ্বংস করেছে, ও দুটো ছাড়া ডিকেন্সের আর সব বই আমার কাছে আছে। সবগুলো গল্প শুনতে আমার দুই বছরেরও বেশি সময় লেগেছে।'

'তবে আমি বোধহয় আপনাকে অনেক দ্রুত পড়ে শোনাতে পারব।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আস্তে ধীরেই শুরু করো, প্রতিটি গল্পের শুরুই আমার কাছে আশ্চর্য এবং রোমাঞ্চকর মনে হয়।'

'ব্লিক হাউস'-এর প্রথম খণ্ড দিয়ে ওদের উদ্বোধন হলো। হেনটি পড়তে শুরু করল।

হেনটি ছোটবেলা থেকেই জোরে জোরে বই পড়তে ভালবাসত। বিয়ের প্রথম বছর সে বউকে কত যে বই পড়ে শুনিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাব ধারণা ছিল বউ গল্প শুনতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু যেদিন সে জানাল এটা তার ওপর রীতিমত অত্যাচারের সামিল, হেনটির বিশ্বাস সেদিন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তারপর সে আর কখনও বউকে বই পড়ে শোনায়নি। অনেকদিন পর এমন চমৎকার একজন শ্রোতা পেয়ে সে মহা উৎসাহে পড়তে লাগল।

মি. ম্যাকমাস্টার হেনটির বিপরীত দিকের দোলনায় হেলান দিয়ে বসে আছেন চোখ দুটো তার দিকে নিবদ্ধ, প্রতিটি শব্দ যেন তিনি গিলছেন, পড়ার সাথে সাথে তারও ঠোঁট নড়ছে নিঃশব্দে। নতুন কোন অধ্যায়ের শুরু হলে তিনি বলছেন, 'ওই নামটা আবার বলো। ওর নামটা আমি ভুলে গিয়েছি,' অথবা, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই মহিলার কথা আমার মনে পড়েছে। মারা গিয়েছিল সে, বেচারি।' পড়ার সময় ঘন ঘন প্রশ্ন করলেন তিনি, চরিত্রগুলো সম্পর্কে হেনটির মতামত জানতে চাইলেন, যেখানে হাসির কিছু নেই বলে হেনটির ধারণা সেখানে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন, কোন কোন অধ্যায় হেনটিকে দুই তিনবার পড়ে শোনাতে হলো, এক জায়গায় তিনি হু-হু করে কেঁদে ফেললেন, কখনও মন্তব্য করলেন, 'ডেডলক লোকটা দেখছি খুব অহঙ্কারী,' কিংবা 'মিসেস জেলীবি তার বাচ্চাদের ঠিকমত যত্নও নেন না।' ইত্যাদি ইত্যাদি। গল্প শুনতে গিয়ে কোন লোককে বইয়ের সাথে এভাবে একাত্ম হতে দেখেনি হেনটি। মি. ম্যাকমাস্টারকে বই পড়ে শুনিয়ে সে নিজেও অনেক আনন্দ পেল।

প্রথম দিন পড়া শেষ হলে মি. ম্যাকমাস্টার বললেন, 'তুমি খুব সুন্দর করে পড়তে পারো। তোমার উচ্চারণ ওই নিগ্রোর চেয়ে অনেক ভাল। আর তুমি গল্প শোনাতেও পারো চমৎকার। তোমার পড়া শুনে মনে হচ্ছিল আমার বাবা যেন আমাকে বই পড়ে শোনাচ্ছেন।'

প্রথম খণ্ড পড়া শেষ হলে দ্বিতীয় খণ্ডে হাত দিল ওরা। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল হেনটির মনে হলো বুড়োর ব্যবহার যেন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সে

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েকবার জানতে চেয়েছে মি. ম্যাকমাস্টার তার যাওয়ার কী ব্যবস্থা করেছেন, কোন গাইড পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু তিনি প্রতিবারই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছেন।

একদিন ব্লিক হাউস পড়ার সময় হেনটি বলল, 'বইটার এখনও অনেকখানি বাকি রয়ে গেছে। আশা করি আমি যাওয়ার আগে গল্পটা শেষ করতে পারব।'

'ও হ্যাঁ,' মি. ম্যাকমাস্টার বললেন, 'তবে ও নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না, বন্ধু। বইটা শেষ করার প্রচুর সময় তুমি পাবে,' বলে হাসলেন তিনি।

এই প্রথম মি. ম্যাকমাস্টারের হাসিতে অশুভ ছায়া দেখতে পেল হেনটি। তার গা কেমন শিরশির করে উঠল। সেদিন সন্ধ্যায়, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ওরা খেতে বসেছে, হেনটি প্রসঙ্গটা আবার তুলল।

'মি. ম্যাকমাস্টার আপনি জানেন আমি অনেকদিন ধরে সভ্য জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। এখন আমাকে ফেরার কথা ভাবতেই হচ্ছে। তাছাড়া আপনার ওপর আর বোঝা হয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।'

মি. ম্যাকমাস্টার শুকনো গরুর মাংস চিবুতে থাকলেন একমনে, কোন কথা বললেন না।

'কয়দিনের মধ্যে আমি একটা নৌকা পেতে পারি, স্যার?—আমার কথা আপনি শুনছেন, মি. ম্যাকমাস্টার? কয়দিনের মধ্যে আমি একটা নৌকা পেতে পারি, বলুন তো? আপনি আমাকে দয়া দেখিয়েছেন সত্য, কিন্তু...'

'বন্ধু, আমি যদি তোমার প্রতি কোন দয়া দেখিয়েও থাকি সব কিছুর মূলে আছেন ডিকেন্স। এঁর দয়া দাক্ষিণ্যের কথা আমাকে না বললেই বরং আমি খুশি হব।'

'ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলছিলাম...'

'হ্যাঁ,' বললেন মি. ম্যাকমাস্টার। 'কালো লোকটিও তোমার মত ছিল। খালি চলে যেতে চাইত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে এখানেই মরতে হয়েছে...'

পরদিন বার দুয়েক হেনটি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার চেষ্টা করল, কিন্তু মি. ম্যাকমাস্টার শুনেও না শোনার ভান করলেন। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে হেনটি বলেই ফেলল, 'মি. ম্যাকমাস্টার, দয়া করে ভণিতা রাখুন। যাওয়ার জন্য নৌকা কিভাবে পাব বলুন?'

'এখানে তেমন নৌকা নেই।'

'ঠিক আছে, তাহলে ইন্ডিয়ানদের একটা তৈরি করে দিতে বলুন।'

'তাহলে বর্ষাকাল পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন নদীতে বেশি পানি নেই। নৌকা চালানো যাবে না।'

'বর্ষা আসতে কতদিন লাগবে?'

'একমাস...অথবা দুই মাস...'

'ব্লিক হাউস' পড়া শেষ হয়ে গেল, 'ডম্বি অ্যান্ড সন' ও যখন শেষ পর্যায়ে এই সময় বর্ষা নামল।

'এখন তাহলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয়,' বলল হেনটি।

'এখন যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, কারণ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে তারা বর্ষাকালে নৌকা তৈরি করে না,' বললেন মি. ম্যাকমাস্টার।

'এই কথাটা আপনি আমাকে আগে বললেও পারতেন।'

'বলিনি বুঝি? তাহলে বোধহয় ভুলে গিয়েছিলাম।'

পরদিন সকালে মি. ম্যাকমাস্টারকে কাজে ব্যস্ত দেখে হেনটি একাই বেরুল বাড়ি থেকে। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সিরিয়ানা ইন্ডিয়ানদের গ্রামে চলে এল। একটা কুটিরের সামনে চার পাঁচজন ইন্ডিয়ান বসা। হেনটি ওদের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। দু'একটা স্থানীয় মাকু শব্দ যা জানত হেনটি তা দিয়ে ওদের সাথে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওদের মুখ দেখে মনে হলো না যে ওরা কিছু বুঝতে পারছে। হেনটি এবার বালিতে একটা ক্যানোর ছবি আঁকল, ইশারায় বোঝাতে চাইল তাকে এরকম একটা নৌকা তৈরি করে দিলে বিনিময়ে সে ওদের বন্দুক, টুপি ইত্যাদি উপহার দেবে। তার ইশারা দেখে একটা মেয়ে শুধু মুখ টিপে হাসল, বাকিরা পাথর হয়ে বসে রইল। হাল ছেড়ে দিল হেনটি। চলে এল ওখান থেকে।

দুপুরে, খাবার সময় মি. ম্যাকমাস্টার বললেন, 'মি. হেনটি, ইন্ডিয়ানরা আমাকে বলেছে তুমি নাকি ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছ। তোমার কিছু প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাইলেই পারতে। তোমার বোঝা উচিত ছিল আমার সম্মতি ছাড়া ওরা তোমার জন্য কিছুই করবে না।'

'আমি ওদের সাথে ক্যানো নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, ওরা আমাকে সে কথাও বলেছে…থাকগে, তোমার খাওয়া শেষ হলে চলো পড়তে বসি। এই গল্পটার মধ্যে আমি একদম ডুবে গেছি।'

'ডম্বি অ্যান্ড সন' ও শেষ হলো এক সময়। হেনটি ইংল্যান্ড ছেড়ে এসেছে, দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেছে। এখান থেকে কবে আবার সভ্য জগতে ফিরতে পারবে জানে না সে। একদিন ডিকেন্সের 'মার্টিন চাজল উইট' বইটি উল্টে পাল্টে দেখছে হেনটি, এমন সময় এক টুকরো কাগজ চোখে পড়ল তার। কাগজে পেন্সিল দিয়ে লেখা :

'১৯১৯ সাল।

আমি ব্রাজিলের জেমস ম্যাকমাস্টার জর্জটাউনের বারনাবাস ওয়াশিংটনকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তিনি যদি "মার্টিন চাজল উইট' বইটি পড়ে শেষ করতে পারেন তাহলে বইটি শেষ করা মাত্র আমি তাকে এখান থেকে চলে যেতে দেব।'

নিচে পেন্সিলের বড় একটি '×' চিহ্ন দেয়া, পাশে লেখা : 'বারনাবাস ওয়াশিংটনের লিখিত এই চুক্তিপত্রে মি. ম্যাকমাস্টার "×" চিহ্ন দিয়ে তার নাম সই করলেন।'

চিঠিটি পড়ে পুরো ব্যাপারটা হঠাৎ করে পরিষ্কার হয়ে গেল হেনটির কাছে। আসল ঘটনা বুঝতে পেরে বুক হিম হয়ে গেল তার। পালিয়ে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছে

হলো। ভয়ে আধমরা হয়ে গেলেও চেহারা স্বাভাবিক রেখে সে সেদিন দুপুরে মি. ম্যাকমাস্টারকে বলল, 'দেখুন মি. ম্যাকমাস্টার, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন এ জন্য আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমি বাড়ি ফিরে আপনার এই ঋণ শোধ করার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আমার সামর্থ্যে যা কুলায় আপনাকে তাই দেব। কিন্তু এখানে আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রেখেছেন। আমি এই অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।'

'কিন্তু বন্ধু, তোমাকে তো কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেনি। ইচ্ছে করলেই তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো।'

'আপনি, স্যার, এটা খুব ভাল করেই জানেন আপনার সাহায্য ছাড়া কোথাও একপা এগুবার উপায় আমার নেই।'

'ধ্যাত, কী যে বলো তুমি। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি? যাক, বাজে কথা বাদ দিয়ে এখন পড়তে শুরু করো।'

'মি. ম্যাকমাস্টার, ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি আপনি আমাকে মানাউসে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলে আমার জায়গায় আরেকটি লোক পাঠিয়ে দেব। সে যাতে সারাদিন আপনাকে বই পড়ে শোনায় সেই ব্যবস্থাও করব।'

'কিন্তু আমার আর অন্য কোন লোকের দরকার নেই। তুমি যথেষ্ট ভাল পড়তে পারো।'

'ঠিক আছে, আমি এই শেষবারের মত আপনাকে বই পড়ে শোনাচ্ছি।' রেগে মেগে বলল হেনটি।

'কিন্তু আমার তা মনে হয় না,' শান্ত সুরে বললেন মি. ম্যাকমাস্টার।

সেদিন সন্ধ্যায় মি. ম্যাকমাস্টার একাই খাবার খেলেন। হেনটি শুধু ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা বলল না।

পরদিন দুপুরেও মি. ম্যাকমাস্টার একা খানা খেলেন। তবে এবার বন্দুকটা তার সাথে থাকল। হেনটি বাধ্য হয়ে আবার 'মার্টিন চাজল উইট' পড়তে শুরু করল।

এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যেতে লাগল। হেনটি একের পর এক 'নিকোলাস নিকলবি,' 'লিটল ডরিট' এবং 'অলিভার টুইস্ট' শেষ করল। তারপর একদিন হঠাৎ মি. ম্যাকমাস্টারের বাড়িতে এক আগন্তুক এসে হাজির হলো। লোকটা একজন স্বর্ণ-সন্ধানী। সোনার খোঁজে এরা মাইলের পর মাইল বন জঙ্গল নদী নালা চষে বেড়ায়। বহু কষ্টে হয়তো কয়েক আউন্স স্বর্ণের গুঁড়া সংগ্রহও করে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অসুখে, অনাহারে কিংবা সাপ খোপের কামড়ে বেঘোরে মারা পড়েছে। মি. ম্যাকমাস্টার আগন্তুককে দেখে মোটেও খুশি হতে পারলেন না। তবুও ক্ষুধার্ত লোকটাকে তিনি বসতে দিলেন, শুকনো গরুর মাংস আর আটার রুটি খেতে দিলেন। লোকটা ঘণ্টা খানেকের মত বিশ্রাম নিল। এই সময়ের মধ্যে মি. ম্যাকমাস্টারের নজর এড়িয়ে হেনটি একটা কাগজে তার নাম আর বর্তমান অবস্থানের কথা লিখে লোকটার পকেটে পুরে দিল।

লোকটা চলে যাওয়ার পর থেকে আশায় বুক বেঁধে থাকল হেনটি। সেই একঘেয়ে ভাবে ওদের জীবন কাটছে। সকালে উঠে ওরা কফি খায়, মি. ম্যাকমাস্টার একা বেরিয়ে যান, সব্জী বাগানের খুঁটিনাটি দেখাশোনা করেন, দুপুরের

খাবার মেন্যুতে থাকে সেই চিরন্তন আটার রুটি আর শুকনো মাংস, বিকেলে ডিকেন্স পড়া হয়, রাতের খাবারের মেন্যুতে দুপুরের পুনরাবৃত্তি, কখনও ফলমূলও থাকে, তারপর ঘুম। সকাল থেকে ঘুমুতে যাবার আগ পর্যন্ত এই অসহ্য রুটিন অনুসরণ করতে হচ্ছে হেনটিকে। তারপরও সে আশা ছেড়ে দেয়নি। প্রত্যাশার আগুন বুকের ভেতর প্রতিনিয়ত ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে।

আজ হোক আর এক বছর পর হোক স্বর্ণ-সন্ধানী ওই লোকটি নিশ্চয়ই ব্রাজিলের কোন গ্রামে গিয়ে তার কথা বলবে। প্রফেসর অ্যান্ডারসনের এতবড় অভিযানের কথা মানুষ এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই ভুলে যেতে পারে না। কে জানে এখনও হয়তো ওদের খোঁজে সার্চ পার্টি গ্রামের পর গ্রাম চষে ফেলছে। একদিন নিশ্চয়ই তারা এই অঞ্চলে এসেও হাজির হবে। হেনটি মি. ম্যাকমাস্টারকে বই পড়ে শোনায় বটে কিন্তু ওর মন চলে যায় সুদূরে। কল্পনায় দেখে সে আবার সভ্যজগতে ফিরে এসেছে, সহি সালামতে মানাউসে এসে পৌঁচেছে, টাকার জন্য টেলিগ্রাফ করেছে, তারবার্তার মাধ্যমে বন্ধুরা তাকে অভিনন্দিত করছে, সে জাহাজে করে বেলেম চলেছে, সমুদ্র ভ্রমণটা অদ্ভুত লাগছে, বউ-র সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে, বউ তাকে জড়িয়ে ধরে অভিমানের সুরে বলছে, 'ডার্লিং, তোমার এতদিন তো বাইরে থাকার কথা ছিল না। জানো, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি হারিয়েই গেলে...'

হঠাৎ মি. ম্যাকমাস্টারের ডাকে তার চমক ভাঙে, 'ওই অধ্যায়টা কী তুমি দয়া করে আরেকবার পড়বে? ওই জায়গাটা আমার কাছে খুব ভাল লাগে শুনতে।'

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যাচ্ছে কিন্তু উদ্ধারের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছে না হেনটি। তবু সে আশা ছেড়ে দিতে নারাজ। তার এখনও ধারণা একদিন না একদিন তার খোঁজে সেই লোকটা আসবেই। আর তাই সে হতাশ হয় না। এমনকি সেদিন যখন মি. ম্যাকমাস্টার তাকে গাঁয়ের এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার দাওয়াত দিলেন, হেনটি রাজি হয়ে গেল। 'এটা ইন্ডিয়ানদের একটা স্থানীয় ভোজ উৎসব,' মি. ম্যাকমাস্টার ব্যাখ্যা করলেন, 'এই উৎসবে ওরা "পিবারী" নামে বিশেষ একটা পানীয় তৈরি করে। জিনিসটা তোমার ভাল নাও লাগতে পারে তবু স্রেফ অভিজ্ঞতার জন্য একটু খেয়ে দেখতে পারো, আজ রাতেই ওদের এই অনুষ্ঠান। চলো, দেখে আসি অনুষ্ঠানটা।'

রাতের খাবার খেয়ে ওরা দুজন ইন্ডিয়ানদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এল। একটা অগ্নিবৃত্তের চারদিকে গোল হয়ে বসেছে কিছু ইন্ডিয়ান। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে সুরে একটা গান গাইছে। গানের সুরটা বিরহের। একটা বড় লাউয়ের খোল সবার হাতে হাতে ঘুরছে। প্রত্যেকেই ভেতরের তরল পদার্থে একবার করে চুমুক দিচ্ছে। হেনটি আর মি. ম্যাকমাস্টারের জন্য ওরা দোলনা নিয়ে এল বসার জন্য। বড় দুটো বাটিও নিয়ে এল। বাটি দুটো কালোরঙের একটা তরল পদার্থে বোঝাই।

'বাটির পুরো জিনিসটা তোমাকে এক চুমুকে খেতে হবে। এটাই ওদের নিয়ম,' বললেন, মি. ম্যাকমাস্টার।

হেনটি চোখ বুজে কৃষ্ণ বর্ণের ঘন, তরল পদার্থটা গিলে ফেলল, স্বাদ নেবার চেষ্টা করল না। জিনিসটা কষা আর মাটি মাটি লাগল। মধু আর রুটি মেশানো

একটা গন্ধও পেল সে। খেতে অবশ্য মন্দ লাগেনি। পানীয়টা খাবার পরপরই শরীর কেমন অবশ ঠেকতে লাগল। ঘুম নেমে আসছে চোখে। নেশা নেশা লাগছে। দোলনায় ঠেস দিয়ে বসল হেনটি। আরেক বাটি পানীয় নিয়ে এল ওরা। এক চুমুকে এই বাটিটাও সাবাড় করল সে। অলস চোখে দেখতে লাগল সিরিয়ানা ইন্ডিয়ানরা আগুনের পাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল হেনটির। ইংল্যান্ডের বাড়ি আর স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙার পর পল হেনটি নিজেকে আবিষ্কার করল ইন্ডিয়ানদের কুটিরে। সূর্যের অবস্থান দেখে মনে হলো বিকেল হয়েছে। এদিক ওদিক তাকাল সে। ধারে কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কটা বাজে এখন? কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখতে যেতেই অবাক হলো হেনটি। ঘড়িটা নেই।

'তাহলে আমি বোধহয় বাড়িতেই ঘড়ি খুলে রেখে এসেছি,' মনে মনে ভাবল হেনটি, 'বাব্বা, কমও তো ঘুমাইনি। একটা রাত আর একটা দিন প্রায় পার করে দিয়েছি। ইস্! ওই জিনিসটা না খেলেই হত।' উঠে দাঁড়াল হেনটি। মাথা যন্ত্রণা করছে। আবার জ্বর আসে কিনা, ভয় পেল সে। হাঁটতেও পারছে না ঠিকমত। ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। খুব কষ্ট করে বাড়ি এল হেনটি। দোরগোড়ায় মি. ম্যাকমাস্টারকে দেখতে পেল।

'এই যে বন্ধু,' মি. ম্যাকমাস্টার হেনটিকে দেখে বলে উঠলেন, 'আজকের বিকালের পড়াটা তো আরেকটু হলেই মিস হয়ে যেত। আর কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তা তোমার এখন কেমন লাগছে?'

'বিশ্রী' মুখ বিকৃত করে জবাব দিল হেনটি, 'ওই পানীয়টা আমার একদম সহ্য হয়নি।'

'ঠিক আছে, চিন্তার কিছু নেই। আমি তোমাকে এমন একটা জিনিস খেতে দেব যে, এখুনি মন ঠিক হয়ে যাবে।'

'আপনি আমার ঘড়িটা দেখেছেন?'

'ওটা হারিয়েছ নাকি?'

'জ্বি। এমন ঘুম ঘুমিয়েছি যে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি।'

'তা অবশ্য ঘুমিয়েছ। কতক্ষণ ঘুমিয়েছ শুনবে? পুরো দুই দিন।'

'দুর, কী যে বলেন। আমি অতক্ষণ ঘুমাতেই পারি না।'

'হ্যাঁ, সত্যি দুইদিন একেবারে মরার মত ঘুমিয়েছ। অবশ্য তোমার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে ঘুমিয়েছিলে বলে তুমি তোমার মেহমানদের সাথে দেখা করতে পারোনি।'

'মেহমান?'

'হ্যাঁ। তুমি তো ঘুমিয়ে পড়লে। আমি চলে এলাম বাড়িতে। খানিক পরেই তিনজন লোক এসে হাজির। তিনজনই ইংরেজ। ওরা তোমার খোঁজেই এসেছিল। তোমার স্ত্রী ওদের পাঠিয়েছিলেন। তুমি বেঘোরে ঘুমুচ্ছিলে বলে তোমাকে আর জাগাতে ইচ্ছে করল না। অবশ্য তুমি যে এখানে আছ একথা তাদেরকে বলিনি। কারণ বললেই তোমাকে ওরা নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। আব আমি

বোকার মত এভাবে তোমাকে হারাতে পারি না, কী বলো বন্ধু? আমি ওদের বললাম তোমার একটা স্মৃতি আমার কাছে আছে, সেটা ওদের দিলে চলবে কিনা? ওরা বলল, তোমার যে কোন একটা স্মৃতিচিহ্ন পেলেই চলবে। কারণ তোমার স্ত্রী নাকি ওদের বলেছেন তোমাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, অন্তত একটা স্মৃতি চিহ্ন পেলেও তিনি নাকি সান্ত্বনা পাবেন। আমি তখন তোমার ঘড়িটা ওদেরকে দিয়ে দিলাম। ঘড়িটা ঘরেই ছিল। ওরা সেটা পেয়ে খুব খুশি। ওরা সেই ক্রসটারও একটা ছবি তুলে নিয়েছে যেটা তোমার আগমন উপলক্ষে আমি তৈরি করেছিলাম। তিনজনেই খুশি মনে চলে গেল দেখলাম। তবে কথা শুনে মনে হলো ওরা আর এদিকে আসবে না। আসলে আমাদের এখানকার জীবন বড় একঘেয়ে আর জোলো…বই পড়া ছাড়া আর কোন কিছুতেই কোন আনন্দ নেই…থাকগে, অনেক কথা বলে ফেললাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে আজ আর তোমাকে ডিকেন্স পড়ে শোনাতে হবে না। তোমাকে একটা ওষুধ দিচ্ছি। ওটা খেয়ে শুয়ে পড়ো। দেখবে কালকের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে। কাল আবার আমরা ডিকেন্স শুরু করব, কেমন? কাল এবং তার পরের দিন এবং তার পরের দিন…আমরা আবার নতুন করে 'লিটল ডরিট' পড়তে শুরু করব। ওই গল্পটা শুনলে আমি আর চোখের জল ধরে রাখতে পারি না, বন্ধু, জানোই তো!'

খুনী

অনেক সয়েছে সে। হ্যারী লোথারিওর আর ক্ষমা নেই। তাকে এবার অবশ্যই মরতে হবে।

মোনা রোপ দোকান থেকে কম দামী একটা হ্যাট কিনল, লিপস্টিক কিনল আরেক দোকান থেকে, আর বেলচাটা কম দামে পেয়ে গেল এক ডিসকাউন্ট স্টোরে। জিনিসগুলো নিয়ে ভাড়া করা সেডানে উঠল মোনা। চেহারায় নিস্পৃহ ভাব ধরে রাখলেও ভেতরে ভেতরে সে খুবই নার্ভাস।

খুব সাবধানে গাড়ি চালাল মোনা যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না সে। বাণিজ্যিক এলাকা ছাড়িয়ে রিভারভিউ বুলেভার্দের দিকে মোড় নিল মোনা। তার বাঁ দিকে সবুজ ঘাসের প্রশস্ত লন সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত বাড়িগুলো। আর ডানের ঢাল গিয়ে মিশেছে নদীর কিনারায়। এদিকে বড় বড় গাছপালার আড়ালে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে বড় লোকদের দামী বাড়ির ছাদ।

বুলেভার্দ থেকে মোড় ঘুরে বার্নহিল্ট ড্রাইভওয়েতে চলে এল মোনা, পাথুরে, সুদৃশ্য একটি বাড়ির ডাবল গ্যারেজের বন্ধ দরজার সামনে ব্রেক কষল। পার্স থেকে দ্রুত চাবি নিয়ে দরজা খুলল সে, সেডানটাকে ভেতরে ঢোকাল, তারপর আবার ফিরে চলল বুলেভার্দের উদ্দেশে। এক সেকেন্ডের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটার দিকে চাইল মোনা, খঁচ করে ঈর্ষার কাঁটা বিঁধল বুকে। স্যালি লাফহার্টি, তার বাল্য বন্ধু, হিউস বার্নহিল্টকে বিয়ে করে কত সুখে আছে! ওরা দু'জনেই এখন ইউরোপে, সামার বিজনেস ভ্যাকেশন কাটাতে গেছে। যাবার আগে স্যালি তার বাড়ির একগোছা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে গেছে মোনাকে।

'উইকএন্ডে যে কোন সময় চলে আসিস এখানে' বার বার বলেছে স্যালি। 'এটা ফ্রান্সের রিভিয়েরা নয় বটে, তবে এখানে এলে তোর মন ভাল হয়ে যাবে। নদীতে ইচ্ছেমত সাঁতার কাটতে পারবি, পার্টি দিতে পারবি।'

মোনা বুলেভার্দের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা ট্যাক্সি ডাকল। বিশ মিনিট পরে আবার ডাউন টাউনে চলে এল। দুই ব্লক পরে ওর পার্ক করা গাড়িটার দিকে দ্রুত এগুলো সে। এখন পর্যন্ত সব কিছু প্ল্যান মাফিক ঠিকঠাক চলছে। কপালের ঘাম মুছল মোনা, ঘামে ভেজা হাতের দিকে চেয়ে ভ্রূ কোঁচকাল, গাড়ির সীটে রাখা বেদিং সুট দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করল, তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। বাড়ি ফিরছে মোনা রোপ, যে বাড়িতে হ্যারী রোপের সঙ্গে দীর্ঘ ষোলোটা বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছে সে।

তবে আর নয়। আর হ্যারীর সাথে এক সঙ্গে থাকতে রাজি নয় মোনা। নাটকের মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে, এবার ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।

অভিজাত এই এলাকার পুবদিকে বেটিফেয়ার চাইল্ডদের বাড়ি। মোনা দেখল

হলুদ শর্টস পরা বেটি লম্বা একটা কাঁচি নিয়ে তাদের বাগানে কাজ করছে। বাগান থেকে কয়েক গজ দূরে মোনাদের বাসা। নিজের বাসার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সে। বেটি মুখ তুলে চাইল, বলল, 'হাই!'

মোনা গাড়ি থেকে নামতে নামতে কষ্ট করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। 'হাই!' আজ খুব গরম পড়েছে, না? সাঁতার কেটে এলে?

মোনা মনে মনে খুশি হয়ে উঠল এই কথায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বেদিং সুটটা বেটির উদ্দেশ্যে নাড়ল। সব কিছু চমৎকার খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। মোনা রোপ যে বুধবার বিকেলটা সুইমিং পুলে কাটিয়েছে তার সাক্ষ্য বেটিই দেবে। বলবে, অফিসার, মোনা ওইদিন যখন বাড়ি ফেরে তখন প্রায় পাঁচটার মত বাজে। ওর হাতে একটা বেদিং সুট ছিল। সে ওটা আমার দিকে তাকিয়ে নেড়ে ছিল।

মোনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গ্যারেজে গেল, গাড়িটা যথাস্থানে রাখল, তারপর বাড়িতে ঢুকল। বেটি ফেয়ারচাইল্ডের চোখের আড়াল হতেই চঞ্চলা হরিণী হয়ে উঠল সে। রান্নাঘরের সিঙ্কে স্যুইম সুটটা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ পর ওটাকে ইউটিলিটি রুমের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মোনা। বেটি ফেয়ারচাইল্ড আবার ঘাস কাটার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। প্রতিবেশীদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর বদভ্যাস আছে বেটির। বিশেষ করে মোনার ব্যাপারে আগ্রহ তার প্রবল।

একটা হাইবল তৈরি করে সিগারেট ধরাল মোনা। দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা পনেরো। আরও মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর বাসায় ফিরবে হ্যারী। ড্রিঙ্কটা নিয়ে কিচেন টেবিলে বসল মোনা হাঁটু ভাঁজ করে। ওর পা থেকে থেকে ঝাঁকি খেলো, জোর করে স্থির হয়ে থাকল মোনা। এয়ারকুলারের থার্মোস্টাটের 'ক্লিক' শব্দে হঠাৎ চমকে উঠল সে। আবার পা ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে। মোনা এবার আর ঝাকুনি থামাতে চেষ্টা করল না। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ঘড়ির দিকে চোখ তুলল। পাঁচটা ষোলো। এখনও চল্লিশ মিনিট। ওর হাতের লোমের গোড়ায় ফুটে উঠেছে স্বেদ বিন্দু। সিঙ্কে গিয়ে মুখ ধুলো মোনা, কলের নিচে হাত মেলে ধরল। ঈশ্বর, এত ঘামছে কেন সে? ঘর তো ঠাণ্ডা। নাকি খুনের আগে সব খুনীরই এ রকম অবস্থা হয়?

আরেকটা হাইবল তৈরি করল মোনা প্রচুর সময় নিয়ে, আগেরটার চেয়ে বড়। হ্যারী নিখোঁজ হলে পুলিশ প্রথমেই তার কারণ জানতে চাইবে। ষোলো বছরের দাম্পত্য জীবনে, বিখ্যাত জুতো তৈরির কারখানা পাইপার-এ যে মানুষটা সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আঠারো বছর কাজ করে গেছে সে কেন হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে যাবে? হ্যারী রোপের কোনও পাওনাদার নেই, যাদের ভয়ে সে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। টাকা পয়সারও অভাব নেই তার। ব্যাঙ্কে মোটা অঙ্কের অর্থ গচ্ছিত আছে, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। আছে চমৎকার একটি বাড়ি, দামী আসবাবপত্র, দুটো গাড়ি। হ্যারী রোপ জুয়া খেলে না, মদ্যপ নয়, অসৎ পথে টাকাও ওড়ায় না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হ্যারীর সম্পর্কে খুবই ভাল। তারা জানে, স্বর্ণকেশী মোনা রোপ চল্লিশোর্ধ্ব বয়সেও যৌবনকে ধরে রেখেছে শক্ত হাতে এবং স্বামীর প্রতি সে খুবই

বিশ্বস্ত।

আচ্ছা, এক মিনিট : হ্যারীর স্ত্রীর ব্যাপারে একটা কথা বলা যাক। মোনা রোপ কি তার স্বামীকে কোন কারণে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে? নাকি এমন কোন কারণ থাকতে পারে যে মোনা হ্যারীকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলল, তারপর 'হ্যারী নিখোঁজ' বলে পুলিশকে জানাল? কিন্তু মোনা তার স্বামীকে খুন করবে কেন? সেফ ডিপোজিটের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে যে টাকা আছে, ওটার জন্য? উঁহু, বিশ্বাস হয় না। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা দিয়ে মোনা বড়লোক হতে পারবে না। জীবন বীমা? হ্যারী রোপ জীবন বীমা করেনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বামী নিখোঁজ হলে কিংবা মারা গেলে মোনা রোপ কোনদিক থেকেই লাভবান হতে পারছে না।

আয়নায় নিজেকে মুখ ভেঙচাল মোনা, তাকাল বাইরে। বেটি ফেয়ারচাইল্ড ঘাস কাটছে না, কিন্তু এখনও বাগানে আছে। ও কেন ওখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছে বুঝতে কষ্ট হয় না। পঁচিশের কোঠায় বয়স, হালকা পাতলা বেটির মনে রাজ্যের সন্দেহ আর অবিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে। মেয়েটাকে দুই চোখে দেখতে পারে না মোনা।

আরও পাঁচ মিনিট পর হ্যারীর কনভার্টিবলটাকে আসতে দেখল মোনা। বেটিদের বাগানের বেড়ার সামনে দিয়ে আসার সময় কি যেন বলল সে বেটিকে। বেটি হাতের হলদে দড়ির ফাঁসটা দুলিয়ে হাসল। হ্যারী ওর দিকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গাড়ি ঢোকাল গ্যারেজে।

হ্যারী যখন কিচেনে ঢুকল মোনা ততক্ষণে তার জন্য একটা নতুন ড্রিঙ্ক নিয়ে তৈরি। হ্যারীর বয়স মোনার সমান হলেও খাটো, রোগা আর মাথায় ছোট চুল বলে ওকে আরও কম বয়েসী দেখায়। কাঁধে কোট, আলগা টাই, জামার বোতাম খুলতে খুলতে হ্যারী মোনার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'হাই, সুইটি। আমার জন্যই ড্রিঙ্কটা বানিয়েছ বুঝি?'

মাথা দোলাল মোনা।

'তুমি বিকেলে সাঁতার কেটেছ?'

'হ্যা।'

রান্নাঘর থেকে বেরোতে বেরোতে হ্যারী বলল, 'ড্রিঙ্কটা বাথটাবে দিয়ে যাও। আমি গোসল করব। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছি।'

এটা হ্যারীর বহুদিনের অভ্যাস। শীত হোক আর গ্রীষ্মই—ঘরে ফেরার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গোসল করা চাই-ই।

মোনা হাত মুঠি করল, প্রাণপণে চেষ্টা করল স্বাভাবিক থাকতে। কান পাতল। কোন সাড়াশব্দ নেই। কপালে ভাঁজ পড়ল মোনার, সাবধানে লিভিং রুমে গেল। ওর বিপরীত দিকে বেডরুম, দরজা খোলা। হ্যারী করছেটা কি? এখনও টাবে ঢুকছে না কেন? এই সময় বাথরুম থেকে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেল সে। ঢিল পড়ল পেশীতে। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল শব্দটা। হ্যারী টাবে ঢুকেছে।

রান্নাঘরে ফিরে এল মোনা, ড্রয়ার খুলে বাঁকানো একটা হাতুড়ি বের করল, জুতো খুলে নিঃশব্দ পায়ে ঢুকল শোবার ঘরে। বাথরুমের দরজা ভেজানো। গলা ছেড়ে গান গাইছে হ্যারী। একটানে দরজা খুলে ফেলল মোনা। শাওয়ারের নিচে

দাঁড়িয়ে ভিজছে হ্যারী, মোনার দিকে পিঠ।

সোজা খুলির ওপর প্রথম আঘাতটা করল মোনা। আঘাতের চোটে সামনের দিকে ছিটকে গেল হ্যারী, কোমর ভেঙে পড়ে গেল বাথরুমের মধ্যে। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্যন্ত বেরুল না। উন্মাদিনীর মত হাতুড়ি চালাতে লাগল মোনা, হ্যারী মারা গেছে বুঝতে পেরে এক সময় থামল।

এই সময় গম্ভীর কণ্ঠটা শুনতে পেল মোনা।

'হ্যারী, বাড়ি আছ?'

মুখ সাদা হয়ে গেল মোনার, শূন্য দৃষ্টিতে চাইল।

'হেই, আমি রয়েস। বাড়িতে আছ নাকি, হ্যারী?'

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড!

কিভাবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে জানে না মোনা, হঠাৎ দেখল সে চলে এসেছে বেডরুমে। হাতে এখনও হাতুড়িটা। স্রেফ জমে গেল মোনা। এই হাতুড়ির কারণে তো সেও মারা পড়বে!

'হ্যারী?'

মোনা বিদ্যুৎগতিতে হাতুড়িটা বালিশের নিচে চালান করে দিল। রয়েস ফেয়ারচাইল্ড সম্ভবত ইউটিলিটি রুমের কাছে চলে এসেছে। জোর করে শক্তি সঞ্চার করল মোনা, বলল, 'আসছি, রয়েস।' টলতে টলতে সে পা বাড়াল সামনে।

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড লম্বা, সুদর্শন এক তরুণ। ওর এক মাথা ঝাঁকড়া কালো চুলের দিকে চাইলেই বুক কেমন শিরশির করে মোনার। রয়েসের সপ্রতিভ উপস্থিতি সব সময়ই তাকে মুগ্ধ করে। রয়েস এই মুহূর্তে ইউটিলিটি রুমের স্ক্রীন ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে সে। বিশালদেহী রয়েসের সামনে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হলো মোনার।

'হাই,' আন্তরিক গলায় ডাকল রয়েস।

'আমি বাথরুমে ছিলাম।' হাসার চেষ্টা করল মোনা। 'জল পড়ার শব্দে তোমার গলা শুনতেই পাইনি।'

'আজ রাতে তুমি আর হ্যারী কোথাও যাবার প্ল্যান করেছ?' জানতে চাইল রয়েস।

'নাহ্,' বলল সে। 'আমার আর হ্যারীর প্ল্যান করে কোথাও যাওয়া হয় না। তবে সন্ধ্যাবেলায় ডাউন টাউনে একবার যাব ভাবছি; কিছু কেনাকাটা করতে হবে। তারপর নাইটশোতে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে ছবি দেখব।'

এত ব্যাখ্যার দরকার ছিল না, রয়েসের হাসি আরেকটু প্রসারিত হলো। 'ভেবেছিলাম রাতে হ্যারীর সঙ্গে কার রেস দেখতে যাব।'

'কিন্তু, আমি তো...'

রয়েস ফেয়ারচাইল্ড চকিতে একবার মোনার দ্বিধান্বিত মুখের দিকে তাকাল, লক্ষ করল মোনা কনভার্টিবলটার দিকে চেয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। 'হ্যারী বাসায় আছে, তাই না? বেটি বলল কিছুক্ষণ আগে নাকি ও বাসায় ফিরেছে। ভাবলাম একবার জিজ্ঞেস করেই যাই ও আমার সঙ্গে যাবে কি-না।'

'কিন্তু হ্যারী তো ওষুধের দোকানে গেছে,' অম্লান বদনে মিথ্যে কথাটা বলল

মোনা।

'তাই?' একটু থেমে রয়েস বলল, 'কিন্তু ওকে তো বেরুতে দেখলাম না। ঠিক আছে, ও এলে একবার আমার বাসায় নক করতে বোলো।'

'আ-আচ্ছা বলব।' গলাটা হঠাৎই যেন বসে গেল মোনার। দাঁড়িয়ে পড়ল রয়েস।

'এনিথিং রং, মোনা?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে।

দুর্বলভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মোনা, উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে। 'আ-আমি···মানে আমার শরীরটা ঠিক ভাল ঠেকছে না। সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে আসার পর থেকে খারাপ লাগছে। যাকগে, এটা এমন কোন ব্যাপার নয়। রয়েস, তুমি···যদি কিছু মনে না করো গ্যারেজের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবে?'

'অবশ্যই দেব।'

'মানে বলছিলাম কি, হ্যারীও নেই, আমি বাসায় একা। দরজাটা বন্ধ থাকলে একটু কম চিন্তা থাকে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বলল রয়েস ফেয়ারচাইল্ড।

'হ্যারীকে আমার কথা বলতে ভুলো না।'

'ভুলব না।'

গ্যারেজের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল মোনা, গা ছেড়ে দিল স্ক্রীন ডোরের কবাটে। ওর বুক ধুকধুক শব্দ করছে, পায়ে কোন জোর নেই। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করার যুক্তিটা নিতান্তই খেলো ছিল, বুঝতে পারে মোনা। কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপদে কাজ সারা তার খুবই প্রয়োজন।

এখন দ্রুত কাজগুলো করতে হবে মোনাকে। রয়েস আবারও আসতে পারে। ইস্, আজ রাতেই কেন হ্যারীকে নিয়ে রেস দেখার ভূত চাপল ওর মাথায়?

শিউরে উঠল মোনা, ঝোলানো লম্বা কম্বলটার এক প্রান্ত খামচে ধরল। তারপর দৌড়ে গেল বাথরুমে। ছোটখাট হ্যারীর গায়ে এত ওজন! বাথরুম থেকে ওকে টেনে তুলতে জান বেরিয়ে গেল মোনার। ধপাস করে লাশটা মেঝেতে ফেলল ও, দুটো তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছল। তারপর একটা কম্বলে মৃত হ্যারীকে পেঁচাল। জামাকাপড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করল। প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে টাকা গুনল মোনা। মাত্র তেইশ ডলার। টাকাগুলো নিয়ে ওয়ালেটটা যথাস্থানে রেখে দিল সে।

আবার ঘামতে শুরু করেছে মোনা। কিন্তু এখন আগের মত আর দুর্বল লাগছে না। ধীরে ধীরে হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছে সে। কম্বলে মোড়ানো হ্যারীর লাশটা টানতে টানতে গ্যারেজে নিয়ে এল মোনা। গাড়ির পেছনের ট্রাঙ্ক খুলল চাবি দিয়ে। কিন্তু এখন ওকে ভেতরে ঢোকাবে কি করে? গোটা লাশ দু'হাতে তোলার শক্তি নেই মোনার। ভয়ানক ভারী হ্যারীর শরীর।

প্রথমে হ্যারীর পা দুটো ধরল মোনা, বাম্পারের ওপর রাখল। লাশটা ডিঙিয়ে ওর পেছনে চলে এসে সে ঝুঁকল, দু'হাতের বেড়িতে শক্ত করে কোমর ধরে টান দিল। মেঝে ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল হ্যারী, কিন্তু নিতম্ব বেধে গেল ট্রাঙ্কের কোনায়। থেঁতলানো মাথাটা বিশ্রীভাবে ঝুলছে। ঘাড়ের পেছনে হাত নিয়ে এল মোনা, মাথাটা

সোজা করে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল ভেতরে। ট্রাঙ্কের এক কোনায় বসার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে থাকল নিষ্প্রাণ দেহটা। হড় হড় করে ওকে সামনের দিকে টান দিতেই ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল হ্যারী।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে মোনার, যেন কয়েক মাইল রাস্তা দৌড়ে এসেছে। ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো দিয়ে লাশটাকে ঢাকল সে, বন্ধ করল ট্রাঙ্ক। তারপর কম্বলটা আবার ইউটিলিটি রুমের মেঝেতে বিছাল। জিনিসটা ভিজে গেছে, তবে শুকিয়ে যাবে শিগগিরই। এখন আর কোন কাজ নেই। এখন কাজ শুধু কালক্ষেপণ।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো ভারী কষ্টের, যন্ত্রণাদায়ক। মোনা ভাবতে থাকে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু। কিন্তু জোর করে অশুভ চিন্তাগুলো মন থেকে দূর করে দেয় সে। বেহুদা টেনশনে ভুগছে সে। সাজানো প্ল্যানের মধ্যে সামান্য ছন্দপতন ঘটিয়েছে কেবল রয়েস ফেয়ারচাইল্ডের আকস্মিক আবির্ভাব। তবে তার কারণে প্ল্যানটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

সাতটা বাজার মিনিট কয়েক আগে রয়েস ফোন করল। জানতে চাইল মোনা হ্যারীকে তার কথা বলতে ভুলে যায়নি তো।

'না, রয়েস। ও এখনও ওষুধের দোকান থেকে ফেরেনি। ও বোধহয় গিনোর বারে গেছে। নইলে এত দেরি হবার তো কথা নয়।'

'ঠিক আছে, আমি হ্যারীকে ওখানেই খোঁজ করছি, মোনা।'

ফোন রেখে দিল মোনা। কাজটা এখন তাকে আরও আধ ঘণ্টা আগে করতে হবে। ভেবেছিল সাড়ে সাতটার আগে বাইরে যাবে না, কিন্তু এখনই না বেরুলে রয়েস আবার হুট করে হাজির হলে বিপদে পড়বে মোনা। দ্বিতীয়বার তার মুখোমুখি হতে চায় না সে। সামাল দিতে পারবে না।

কনভার্টিবলটাকে নিয়ে বেরুচ্ছে মোনা, দেখল রয়েস জানালা দিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। ইচ্ছে হলো ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটায়, চোখের পলকে শহর ছেড়ে দূরে চলে যায়।

দাঁতে দাঁত চাপল মোনা। না, আতঙ্কিত হলে চলবে না। আতঙ্ক ওকে ফাঁদে ফেলবে, আর তার নিশ্চিত পরিণাম ডেথ চেম্বার। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে বার্নহিল্টদের বাড়িতে চলে এল মোনা। এখানে, ডাবল গ্যারেজের ভেতরে সে ভাড়া করা গাড়িটা রেখে গেছে। হ্যারীর লাশ আর জামাকাপড়ের স্তূপ সেখানে ঢোকাল সে, ট্রাঙ্কের মধ্যে বেলচাটা রাখল, আর বিকেলে কেনা অন্যান্য জিনিসপত্রগুলোর স্থান হলো কনভার্টিবলে।

এবার ডাউনটাউনে চলে এল মোনা, বুকের মধ্যে ভয় চেপে দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়াল, খামোকা এটা ওটার দাম জানতে চাইল। ঘণ্টাখানেক পর একটা ড্রাগস্টোরে সে যখন ঢুকল, ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে আটটা। ওর বন্ধু প্যাট ডডসনের সঙ্গে আরও আধঘণ্টা পর দেখা করার কথা। হয়তো প্যাট ইতোমধ্যে রেডি হয়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে তার জন্য।

একটা বুদ থেকে ফোন করল মোনা প্যাটকে। প্যাট যা বলল শুনে হিম হয়ে গেল সে। 'মোনা আজ রাতের প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করা যায় না? আমি অনেকক্ষণ

ধরে তোমার বাসায় ফোন করছি। কেউ ধরে না। আমার খুব মাথা ধরেছে মোনা। আমি ছবি দেখতে যেতে পারব না, তাই।'

মোনার পা কাঁপছে থরথর করে। যদি বিশেষ কোন সাক্ষী দরকার হত তাহলে প্যাট ডডসনই হত তার অন্যতম সাক্ষী। 'তু-তুমি ওষুধ খাওনি?' কথা খুঁজে পাচ্ছে না মোনা। কোনমতে বলল, 'বাইরে বেরুলে ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ধরাটা নিশ্চয়ই ছেড়ে যেত।'

'ঘুম, মোনা, এটাই এখন আমার একমাত্র ওষুধ। আরেকদিন না হয় তোমার সঙ্গে ছবি দেখব। সুস্থ হলে কাল রাতে?'

'না,' ইতস্তত করল মোনা, অনুরোধ করে লাভ হবে না বুঝে বলল, 'আমি আজ রাতেই ছবিটা দেখব, প্যাট, কাল নয়।'

'ঠিক আছে, দেখো তাহলে। যেতে পারছি না বলে আবারও দুঃখিত।'

ড্রাগস্টোর থেকে বেরিয়ে এল মোনা। শরীর ভয়ানক দুর্বল ঠেকছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। চিন্তাভাবনাগুলো সব গিঁঠঠু পাকিয়ে গেছে। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না, নিজেকে শাসাল ও, ভাবতে হবে। ভেবে চিন্তে প্রতিটি পা ফেলতে হবে।

আউল ফাউল না ঘুরে মনস্থির করে ফেলল মোনা। বাঁক ঘুরে সিনেমা হলের দিকে এগোল। হলের সামনে আসতেই চট করে আইডিয়াটা মাথায় খেলে গেল। দ্রুত পায়ে ফিরে এল পার্ক করা কনভার্টিবলে, বিকালে কেনা জিনিসগুলোর প্যাকেট দুটো নিয়ে সিনেমা হলে ঢুকল। লিপস্টিকের প্যাকেটটা টিকেট কাউন্টারের জানলার পাশে ফেলে গেটের দিকে তাকাল। কাউন্টারের মেয়েটা বুথের দরজা খুলে ডাক দিল, 'ম্যাম?'

ঘুরল মোনা, মেয়েটা ছোট্ট প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরেছে ওর দিকে। হাসল সে, মেয়েটাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগ্রহে প্রবেশ করল। এখন একটু স্বস্তি লাগছে। প্রয়োজনের সময় কাউন্টারের মেয়েটা ওকে অন্তত স্মরণ করতে পারবে।

ছবিটা কমেডি ধাঁচের। অন্যসময় হলে মোনা এই ছবি দেখে হাসতে হাসতে খুন হয়ে যেত, কিন্তু দুই ঘণ্টা পর হল থেকে বেরিয়ে ও আবিষ্কার করল আসলে পর্দার দিকে তাকিয়েছিল শুধু, কিছুই দেখেনি।

সময় কাটানো মোনার জন্য এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। সে অস্থির হাতে কনভার্টিবলের রেডিওর সুইচ অন করল। রেডিওতে আবহাওয়ার খবর হচ্ছে। আগামী ছয় ঘণ্টার মধ্যে প্রবল ঝড় শুরু হতে পারে, সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন সংবাদ পাঠক। তাই নগরবাসীদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। মোনা কপাল কোঁচকাল। আসন্ন ঝড়টা তাকে সাহায্য করবে না বিপদে ফেলবে?

বাড়ি ফেরার সময় মোনা দেখল ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়ির আলোকিত জানালা দিয়ে একটা মুখ তাকে লক্ষ্য করছে। আড়ষ্ট হাসল মোনা। ভালই হলো বেটি জানল সে কখন ছবি দেখে ফিরেছে। গ্যারেজে গাড়ি রেখে প্যাকেটগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকল মোনা। আধঘণ্টা পর সমস্ত বাতি নিভিয়ে অন্ধকার একটা জানালার সামনে এসে বসল। এখান থেকে ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মধ্যে

বেটির আকৃতি ফুটে উঠতে দেখল সে জানালার কাঁচে। কিন্তু রয়েসকে দেখা গেল না। এখন রাত একটা। বেটি এখনও ঘুমাতে যাচ্ছে না কেন? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বেটি ঝড়বাদল খুব ভয় পায়। ঝড়বৃষ্টি হবে শুনলে সে ঘুমাতে পারে না।

নিয়তি দেখছি আমার সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করেছে, ভাবল মোনা। তার বাইরে বেরুবার ব্যাপারটা বেটির চোখে কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না। আর ঝড়ঝঞ্ঝার রাতে ফেয়ারচাইল্ডরা নিশ্চয়ই আশা করে না মোনারা সব বাতি জ্বালিয়ে রাখবে?

সময় হয়েছে বুঝতে পেরে সামনের দরজা দিয়ে বেরুল মোনা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ফেয়ারচাইল্ডদের জানালার দিকে, কেউ উঁকি দিচ্ছে কিনা দেখতে। অন্ধকারে চোখ সইয়ে উঠান পেরোল সে, উঠে এল ফুটপাথে। দ্রুত পা চালাচ্ছে মোনা। হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। তারা জ্বলছে। ঝড় নাও আসতে পারে।

শপিং সেন্টারের ট্যাক্সিস্ট্যান্ড, এখানে সারারাত ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায়, একটা ক্যাবে ড্রাইভারকে মুখ হাঁ করে ঘুমাতে দেখল মোনা। দরজা খুলে ব্যাকসীটে বসল সে। আশা করল অন্ধকারে ড্রাইভার তাকে ভালমত লক্ষ করতে পারবে না। ড্রাইভার মোনার দিকে প্রায় তাকালই না, ঘুম ঘুম চোখে মাত্র একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল। মোনা তাকে রিভারভিউ বুলভার্ডে যেতে বলল। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভারকে ভাড়ার সঙ্গে পঞ্চাশ সেন্ট বকশিশও দিল। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল একটা অন্ধকার বাড়ি লক্ষ্য করে। খানিকটা এগিয়ে যখন বুঝল ড্রাইভারের চিহ্নও নেই কোথাও, ফিরে এল সে বুলেভার্দে, পার হলো রাস্তা, এগিয়ে চলল বার্নহিল্টদের বাড়ি অভিমুখে।

হ্যারীকে কবর দেয়ার জায়গাও ঠিক করে রেখেছে মোনা। গত রোববার বিকালে ওদিকটা ভাল মত দেখে যায় সে। হাইওয়ে ছাড়িয়ে একটা সরু মেঠো পথ চলে গেছে গাছপালার মধ্য দিয়ে, শেষ হয়েছে একটা খাদের মাথায়, ওখানে।

ভাড়া করা সেডানটা নিয়ে মোনা এখন সেদিকেই চলেছে। হেডলাইটের আলো চিরে দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। মেঠো রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে গাড়ি থামাল মোনা, লাইটের সুইচ অফ করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। দ্রুত শ্বাস ফেলছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে গাড়ি থেকে নামল সে বেলচা নিয়ে। গভীর একটা কবর খুঁড়ল ত্রস্ত হাতে, স্বামীর দলা পাকানো লাশ আর পোশাকগুলো ছুঁড়ে ফেলল গর্তে। দূরে, শহরের সীমানার কালো আকাশে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ, গুরুগুরু আওয়াজ ভেসে এল কয়েক সেকেন্ড পর। কবরে মাটি ভরাট করার সময় একটা দুশ্চিন্তা মাথায় ভর করল মোনার। বৃষ্টি হলে ভেজা মাটিতে তার গাড়ির চাকার ছাপ থেকে যাবে। সুতরাং বৃষ্টির আগেই হাইওয়েতে ফিরতে হবে তাকে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি ব্যাক করছে মোনা, যান্ত্রিক বাহনটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। 'আস্তে' নিজেকে পরামর্শ দিল মোনা, সাবধানে চালাও মেয়ে। এমন বিদঘুটে একটা জায়গায় কোন সমস্যায় পড়লে বারোটা বেজে যাবে তোমার।

হাইওয়েতে উঠে আসতেই সশব্দে চেপে রাখা শ্বাস ফেলল মোনা। ঝড়

আসছে। একটু বিরতির পরপরই আলো হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার আকাশ। নদীর ব্রিজটা সামনেই। ওর সামনে কিংবা পিছনে কোন গাড়ি নেই দেখে স্বস্তি পেল মোনা। ব্রিজে উঠে গাড়ি থামাল সে। চট করে নেমে বেলচাটা রেলিং-এর ওপর দিয়ে নদীতে ফেলে দিল। মাইল দুয়েক দূরে শহরের আলোকমালা, ফ্যান্টাসি ছবির মত জ্বলছে। সন্তুষ্টি বোধ করল মোনা, গাড়ি ছেড়ে দিল—আর তক্ষুণি ওর বুকের ভিতর লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড।

সামনে আলো জ্বলছে। অথচ মোনা ভাল করেই জানে এখানে আলো জ্বলার কোন কারণ নেই। সম্ভবত রোড ব্লক, ঘূর্ণায়মান লাল বিকন বাতিগুলো যেন পিশাচের চোখ।

পুলিস! যেভাবেই হোক ওরা তার কুকীর্তির কথা জেনে গেছে আর এখানে অপেক্ষা করছে কখন সে শহরে ফিরবে তার জন্যে।

ব্রেকে আলতো একটা পা রাখল মোনা। চোখ দুটো কোন সাইড রোড খুঁজছে।

কিন্তু পুলিস কি করে এত তাড়াতাড়ি টের পেল? দ্রুত মাথা হাতড়াল মোনা। নাহ্, টের পাবার কোন প্রশ্নই নেই। নির্ঘাত সামনে কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। আর এ জন্যেই রোড ব্লক।

ধীরগতিতে গাড়ি চালাল মোনা। হেড লাইটের আলোতে ইউনিফর্ম পরা এক পুলিস অফিসারের আকৃতি পরিষ্কার হয়ে উঠল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতের লাল আলো দিয়ে সামনে আসতে ইশারা করল মোনাকে, মোনা খেয়াল করল রাস্তার একটা দিক শুধু বন্ধ—যারা শহর ছেড়ে আসছে শুধু তাদের গাড়ি থামানো হচ্ছে। পুলিস অফিসার লাল ফ্ল্যাগলাইটের আলো দিয়ে ইঙ্গিত করল—যেতে পারে মোনা। রোড ব্লক পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পড়ল মোনা। চিরিক চিরিক ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, বিকট শব্দে কাছে কোথাও বাজ পড়ল। মোনার গাড়ি থামাতে ইচ্ছে করছে, মন চাইছে প্রাণভরে শ্বাস নিয়ে একটু সুস্থির হতে। কিন্তু এগিয়ে চলল সে, ডাউনটাউন থিয়েটার পার্কিং লটের দিকে গাড়ি ছোটাল। দুই ব্লক পরে কাররেন্টাল এজেন্সি, তার পরেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করল মোনা, একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। বলল, শপিং সেন্টার কমপ্লেক্সে যাবে। বাতাসের ঝাপটায় রাস্তার খড়কুটো উড়তে শুরু করেছে, ভাড়া মিটিয়ে মাত্র ফুটপাথে পা রেখেছে মোনা, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল গায়ে। তাড়া খাওয়া কুকুরের মত বাড়ির দিকে ছুটল মোনা। তিনটে ব্লক পরেই তার বাড়ি। সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা মাত্র প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। নিজেকে এত দুর্বল লাগল, মনে হলো যে, একটা হপ্তা না ঘুমালে সে আর শক্তি ফিরে পাবে না।

কিন্তু ঘুম এল না। দুশ্চিন্তায় ভার হয়ে থাকল মাথা। অনেক কিছু পিছনে ফেলে এসেছে সে, আরও কত কি সামনে অপেক্ষা করছে কে জানে। অন্ধকারে হাতড়ে রান্নাঘরে ঢুকল মোনা, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ফেয়ারচাইল্ডদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বেটি এখনও ঘুমায়নি? নাকি জেগে থাকার ভান করছে? আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল মোনা, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলাল। আরেকটু হলেই

মস্ত এক ভুল করতে যাচ্ছিল সে। বেটি জেগে থাকলে আলো জ্বললেই সে দেখতে পেত মোনার গায়ে বাইরের পোশাক···।

মোনা কাপড় পাল্টাল। রাতের পোশাক পরল। হঠাৎ বালিশের নিচে রাখা হাতুড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখল মোনা, হাতুড়িটা নিয়ে রান্না ঘরে গেল, ওটাকে একটা ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর আলো জ্বালল, সিগারেট ধরাল। এখন বেটি ফেয়ারচাইল্ড ওকে ইচ্ছে মত দেখুক। দেখুক ঝড়ের রাতে তার মত আরও একজন নির্মম সময় কাটাচ্ছে।

মোনা কফি বানিয়ে নিল। পরবর্তী চারটে ঘণ্টা তার কাটল মারিজুয়ানা সেবন করে আর বাইরে ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি শুনে। সকাল সাতটার দিকে ঝড়ের তাণ্ডব থেমে গেল, শুধু বর্ষণধারা অব্যাহত রইল। আটটা বাজার কয়েক মিনিট আগে মোনা শুনল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রয়েস ফেয়ারচাইল্ড। আরও মিনিট বিশেক কাটিয়ে দিল সে কাপড় পরার কাজে। তারপর বেরিয়ে পড়ল কনভার্টিবলটা নিয়ে। দেখল জানালার পাশে বসে আছে বেটি, ওকে লক্ষ করছে। থিয়েটার পার্কিং সেটে চলে এল মোনা, ভাড়া গাড়িটা এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করল। ইচ্ছে করলে কাল রাতেই কাজটা করতে পারত সে। কিন্তু তাতে ধরা পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। রাত সাড়ে তিনটায় গাড়ি ফেরত দিতে গেলে এজেন্সি সহজেই তাকে চিনে রাখত; কিন্তু সকাল নটা বিশ-এ সেই আশঙ্কাটা নেই।

অ্যাটেনডেন্ট লোকটা লম্বা-চওড়া কিন্তু নোংরা, দেখে মনে হয় 'গোসল' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়।

'কাজ শেষ, ম্যাম?' জিজ্ঞেস করল সে।

শান্ত গলায় জবাব দিল মোনা, 'হ্যাঁ।' ভাড়া চুকিয়ে পা বাড়াল অফিসের বাইরে।

পেছন থেকে ডাক দিল লোকটা, 'শুনুন, শুনুন! গাড়ির হাবক্যাপটা কোথায় ফেলে এসেছেন, ম্যাম?'

মোনা থমকে দাঁড়াল, ঘুরল। লোকটা সেডানের ডান দিকের হুইলের পাশে দাঁড়ানো, কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে মোনার দিকে। হুইলের ওপর কোনও হাবক্যাপ নেই।

মোনা কোন কথা বলতে পারল না। ওর জিভটা যেন আঠা দিয়ে লেগে আছে টাকরায়। হাবক্যাপটা হারাল কিভাবে? কোথায় কবরে? নাকি মেঠো রাস্তাটার কোথাও? অথবা থিয়েটার পার্কিং লটে?

'আ-আমাকে কি এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে?' তোতলাতে তোতলাতে বলল মোনা।

লোকটা মোনার আগাপাশতলা যেন চাটল চোখ দিয়ে। নিজের সঙ্গে বোধ হয় যুদ্ধ করছে। তার পাতলা ঠোঁটজোড়া একদিকে বেঁকে গেল, বিড়বিড় করে বলল, 'না, আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আমাদের বীমা করা আছে।'

কাঠ হয়ে এজেন্সি অফিস থেকে বেরুল মোনা, এগোল কনভার্টিবলের দিকে। গাড়ি নিয়ে শপিং সেন্টার সুপার মার্কেটে চলে এল ও, খামোকা বেশ কিছু মুদি সওদা কিনল। তারপর ফিরে এল বাড়িতে। ওর চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। কাঁপা হাতে কফি ঢালল কাপে, চুমুক দিল। হাবক্যাপ হারানোর ঘটনাটা ছাড়া আর সবকিছুই এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে পুলিসে খবর দেয়ার আগে আরও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। এখন দশটা চল্লিশ বাজে। পাইপার-এর নম্বরে ফোন করল মোনা।

পাইপারের যে লোক ফোন ধরল, সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানাল, না, মি. রোপ এখনও অফিসে পৌছেননি। আর এভাবে তিনি কখনোই অনুপস্থিত থাকেন না। অফিসে আগে না জানিয়ে মি. রোপ আজ পর্যন্ত কোথাও যাননি। পাইপার কি এ ব্যাপারে মিসেস রোপকে কোন সাহায্য করতে পারে?

কিন্তু মোনার কোনও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

সে এবার পুলিস ডিপার্টমেন্টে রিং করে মিসিং পারসনস ব্যুরোর নাম্বারটা চাইল। ও ধারের লোকটা নিরাসক্ত গলায় বলল তার স্বামী হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় ফিরে আসবেন, মিসেস মোনা খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন। হয়তো গতকালকের ঝড় জলের জন্যে তিনি বেশি মাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, অফিসার।'

'ঠিক আছে, আপনি যদি অন্য কোন আশঙ্কা করে থাকেন তাহলে আমরা কি এখান থেকে লোক পাঠাতে পারি—'

'সত্যি পাঠাবেন? প্লীজ!'

ব্যাঙ্কস নামে এক তরুণ সার্জেন্টকে পাঠাল ওরা। লোকটার বয়স খুব বেশি হলে ত্রিশ। সে মোনাকে যারপর নাই বিস্মিত করল। মনে হলো মোনার কষ্ট সে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে। সার্জেন্টকে পছন্দ হয়ে গেল মোনার তার প্রশ্নের ধরন শুনে। হ্যারি সম্পর্কে বিস্তারিত নোট নিল সে, বলল মোনা যেন তার স্বামীর জন্যে খুব বেশি চিন্তা না করে। আশা করা যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

মিনিট বিশেক পর বিদায় হলো সার্জেন্ট। বেটি ফেয়ারচাইল্ড এল মোনার সঙ্গে কথা বলতে। রাতে বোধ হয় ঘুমায়নি, চোখ বসে গেছে, কিন্তু তাকে বেশ কৌতূহলী আর উত্তেজিত দেখাল।

'একটু আগে যে গাড়িটা দেখলাম,' হড়বড় করে বলল বেটি, 'পুলিসের গাড়ি মনে হলো! কি হয়েছে, মোনা?'

মোনা ওকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল।

যেন স্তম্ভিত হয়েছে কথাটা শুনে এমনভাবে বেটি বলল, 'হ্যারি কাল রাতে বাসায় ফেরেনি?'

'অফিস থেকে ফেরার পর আমাকে বলল ওষুধের দোকানে যাচ্ছে। তারপর থেকে ওর আর কোন সংবাদ নেই।'

'কোথায় যেতে পারে, বলো তো?'

'আমি জানি না, বেটি।'

'অফিসে খোঁজ নিয়েছ?'

মোনা মনে মনে উল্লাস বোধ করল। 'সকালেই নিয়েছি। কিন্তু ওরা বলল হ্যারি অফিসে যায়নি…'

'হা ঈশ্বর।' শ্বাস টানল বেটি। 'সব ঘটনা দেখছি এক সঙ্গে ঘটছে! প্রথমে ঝড় এল, তারপর ব্যাঙ্ক ডাকাতি, আর এখন হ্যারি—'

'ব্যাঙ্ক ডাকাতি?'

'রেডিওতে শোনোনি? কাল রাতে ডাউনটাউনের একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। সারা শহরে রোড ব্লক বসানো হয়েছে। আর...'

বেটির কথা কানে ঢুকছে না মোনার। কাল রাতে রোড ব্লকে পড়ে কি রকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল মনে পড়তেই পেট ফেটে হাসি এল ওর। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল ও।

বেটি জিজ্ঞেস করল, 'মোনা, হ্যারি হঠাৎ করে এভাবে নিখোঁজ হওয়ার কারণ কি, বলো তো?'

মোনা কোন জবাব দিল না।

পরদিন আবার এল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। গৎ বাঁধা প্রশ্নগুলো করল। মোনার যখন সমস্ত জবাব ফুরিয়ে গেল, সার্জেন্ট উদাসীন মুখ করে বলল, 'আপনি বোধ হয় জানেন, মিসেস রোপ, আপনার স্বামী পরনারীতে আসক্ত ছিলেন?'

মোনার আঁতকে ওঠার অভিনয়টা নিখুঁত হলো। 'সবাই যুবতী,' বলে চলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। 'ধারণা করা হচ্ছে ওরা প্রত্যেকে পাইপার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত।'

মোনার চেহারা করুণ হয়ে উঠল।

'এসব কেস-এ আমরা প্রথমেই যে জিনিসগুলো চেক করি তা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা, দাম্পত্য সুখ—।'

মোনা রাগের ভান করল। 'আমাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল।'

'জ্বী?'

'আর হ্যারী কখনও—'

'আমি দুঃখিত, মিসেস রোপ,' বাধা দিল সার্জেন্ট। 'আমরা তদন্ত করে দেখেছি আপনার স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে তরুণী আর যুবতী কয়েকটি মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ছিল।'

মোনা নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল। সার্জেন্ট চলে যেতেই সে রান্নাঘরে ঢুকল, কাপে কফি ঢেলে তাতে বুরবন মেশাল, তারপর নীরবে পানীয়টা উৎসর্গ করল তার মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে : 'চিয়ারস, হ্যারী লোথারিও রোপ!'

শনিবার, সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস একটা বোমা ফাটাল। পাইপার কোম্পানিতে হ্যারীর কাগজপত্র ঘেঁটে জানা গেছে সে বেশ কিছু অর্থ আত্মসাৎ করেছে।

'ক-কত টাকা পাওয়া যাচ্ছে না?' জানতে চাইল মোনা।

'দশ হাজার ডলারের মত।'

'আপনাদের কি ধারণা হ্যারী টাকাগুলো নিয়ে পালিয়েছে?'

'তার সঙ্গে যে সব মেয়ের সম্পর্ক ছিল তারা কেউ পালায়নি, শুধু হ্যারী আর টাকাগুলোর কোন খবর নেই।'

'আচ্ছা!' বলল মোনা। এতদিনে বুঝতে পারল হ্যারী মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করার টাকা কোত্থেকে জোগাড় করত। এই মেয়েঘটিত ব্যাপার নিয়ে অনেক ঝগড়া

হয়েছে তার হ্যারীর সঙ্গে। কিন্তু হ্যারী তাকে পাত্তাই দেয়নি। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মোনা। তারপর…

'সত্যি, এটা খুব হৃদয়বিদারক সংবাদই বটে।'

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কসের কথায় চমক ভাঙল মোনার। চোখ তুলে চাইতেই দেখল মোনা তার দিকে চেয়ে আছে সার্জেন্ট।

'আমি ভাবছিলাম…' ইতস্তত গলায় বলল মোনা। 'ভাবছিলাম কয়েকদিনের জন্যে ধরুন, ধরুন হপ্তাখানেকের জন্যে যদি বাইরে যাই কেমন হয়। এই ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হবে। বিশেষ করে যেখানে টাকা পয়সার প্রশ্ন জড়িত…আমার আসলে এখন দিন কয়েক কোথাও একা কাটিয়ে আসা দরকার।'

'নির্দিষ্ট কোথাও যেতে চাইছেন, মিসেস রোপ? আপনার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে।'

'লেক চার্লসের নাম শুনেছেন?'

'জ্বী।'

'ওখানে একটা বাড়ি আছে। ওখানে আমি আর হ্যারী একবার…যাকগে, কিছু ভাববেন না। বাড়িটার নাম শেডি ওকস।'

'ঠিক আছে, মিসেস রোপ।'

'তাহলে আমি যেতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

শহর ছেড়ে ওইদিন বিকালেই বেরিয়ে পড়ল মোনা। মাইল বিশেক যাবার পর ওর সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। শেডি ওকসের আশপাশে পুলিসী ছায়া আবিষ্কার করল মোনা। একটি যুবক বয়সের ছেলেকে ওর কাছে পিঠে প্রায়ই ঘুরঘুর করতে দেখল সে।

মঙ্গলবার সকালে অবশ্য যুবক ভণিতা ছেড়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল মোনাকে নিয়ে তার শহরে ফিরতে হবে।

'আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না হ্যারী তার দশ হাজার ডলারসহ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?' তিক্ত গলায় বলল মোনা।

'আপনার স্বামীর খোঁজ পাওয়া গেছে, মিসেস রোপ। আর আমার ধারণা তিনি খুন হয়েছেন।' গম্ভীর গলায় বলল সে।

হেডকোয়ার্টারে দু'জন পুলিস অফিসার জেরা করল মোনাকে। সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস লেফটেন্যান্ট পোলিং নামে একজন অমায়িক স্বভাবের অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। পোলিং খুব বিনীতভাবে মোনার কাছে জানতে চাইল হ্যারী যেদিন নিখোঁজ হয় সেদিন আসলে কি কি ঘটেছিল। সব বিস্তারিত বর্ণনা দিল মোনা। সপ্রতিভভাবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পেরে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল সে। মোনা জানে ওর গল্প খতিয়ে দেখা হবে, পুলিস ভেরিফিকেশন হবে। বেটি ফেয়ারচাইল্ড জানাবে ঘটনার দিন বিকালে মোনাকে সে মিউনিসিপ্যাল পুল থেকে পাঁচটার সময় সাঁতার কেটে আসতে দেখেছে, আর মোনা কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তার সাক্ষী দেবে রয়েস ফেয়ারচাইল্ড। আর প্যাট-ওডসন বলবে সে কথা দিয়েও বুধবার রাতে মোনার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতে পারেনি। সিনেমা হলের

টিকেট বিক্রেতা মেয়েটাও মোনাকে স্মরণ করতে পারবে। বলবে, হ্যাঁ, এক মহিলা ওইদিন নাইট শোতে ছবি দেখতে এসেছিলেন। ভুলে তাঁর একটা প্যাকেট ফেলে যাচ্ছিলেন কাউন্টারে। আর ছবি দেখে মোনা কখন ফিরেছে সে ব্যাপারেও বেটি সাক্ষী দেবে। জানাবে, যখন ঝড় শুরু হয় ওই সময় সে রোপদের বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছে।

প্রশ্নপর্ব শেষ হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মোনা। লেফটেন্যান্ট পোলিং নরম গলায় বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, মিসেস রোপ, আপনাকে প্রশ্ন করা আমাদের দরকার ছিল।'

'অবশ্যই। টাকা পয়সার ব্যাপারটাও যেহেতু এর সঙ্গে জড়িত। তবে আমি কল্পনাও করিনি হ্যারী টাকা চুরি করতে পারে।'

'আমরা এ জন্যই আপনাকে লেক চার্লসে যেতে দিয়েছি,' বলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস।

'আপনারা কি ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে হ্যারীর কোথাও সাক্ষাৎ হবে? আমি টাকার কথা কিছুই জানতাম না, সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। ব্যাপারটা আমার জন্যে খুবই মর্মবেদনার কারণ ছিল।'

'আমরা ধারণা করতে পারছি টাকাটা বেশিরভাগ কোথায় ব্যয় হয়েছে,' বলল লেফটেন্যান্ট পোলিং।

'মানে…হ্যারীর সঙ্গে যে সব মেয়ের সম্পর্ক ছিল তাদের কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'আমাদের আরও সন্দেহ ওদেরই কেউ হাতুড়ির বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে খুন করেছে হ্যারীকে।'

পাথর হয়ে গেল মোনা।

'আপনি নৃশংস ঘটনাটা শুনবেন, মিসেস রোপ?'

মোনা জানে না সে সায় দিয়েছে কিনা, কিন্তু লেফটেন্যান্ট পোলিং গল্পটা বলতে শুরু করল: আমাদের ধারণা বুধবার রাতে আপনার স্বামী ওষুধের দোকানের কথা বলে বেরিয়ে পড়েন। হয়তো আগেই কথা হয়েছিল, কিংবা এও হতে পারে পথে মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তারা সন্ধ্যাটা একত্রে কাটায়। তারপর সন্ধ্যারই কোন এক সময় মেয়েটা আপনার স্বামীকে ভারী এবং ভোঁতা কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে। সম্ভবত হাতুড়ি জাতীয় কিছু হবে। মেয়েটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। তারপর সে লাশটাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়। কবর খুঁড়ে আমরা যখন লাশটা বের করি, মুর্দার পরনে কোন কাপড় ছিল না। কিন্তু তার জামা কাপড়গুলো কবরের মধ্যেই পাওয়া গেছে। আর তার ওয়ালেট। ওটাও খালি ছিল।'

'লে-লেফটেন্যান্ট,' তোতলাচ্ছে মোনা, 'আ-আপনি কিন্তু এখনও বলেননি কিভাবে…কিভাবে আপনারা হ্যারীর খোঁজ পেয়েছেন।'

'একটা বাচ্চার কৌতূহলের কারণে,' মুখ অন্ধকার করে বলল লেফটেন্যান্ট পোলিং। 'একটা হাবক্যাপ ছিল তার কৌতূহলের কারণ। ছেলেটা ওখানে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা খাদের পাশে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে চকচকে হাবক্যাপটা তার নজর কেড়ে নেয়। খাদটার পাশে স্তূপ করা মাটি দেখে তার নতুন কবর বলে

সন্দেহ হয়। হাত দিয়ে কবরটা খুঁড়তে শুরু করে। থামল যখন নগ্ন পা জোড়া চোখে পড়ল, তখন। স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল সে।'

'একটা...হাবক্যাপ?' বিড়বিড় করে বলল মোনা।

'এখন সেই গাড়িটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যেটার চাকা থেকে জিনিসটা খসে পড়েছে,' বলল পোলিং।

'পা-পারবেন?'

'সেটাই তো এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা, মিসেস রোপ। এ যেন খড়ের গাদায় ছুঁচের সন্ধান করছি আমরা।'

'যদি...যদি আপনারা খোঁজ পান?'

'তাহলে বুঝব আমরা খুনী মেয়েটাকে পেয়ে গেছি।'

অবিশ্বাস্য মন্থর গতিতে কাটতে লাগল দিন। খবরের কাগজে ফলাও করে হ্যারী খুনের রহস্য ছাপা হচ্ছে। পুলিস হন্যে হয়ে হাবক্যাপবিহীন গাড়ির সন্ধানে ব্যস্ত। তারপর বেটি আর রয়েস ফেয়ারচাইল্ডদের অদম্য কৌতূহল তো আছেই। আর যতদিন যাচ্ছে, টের পাচ্ছে মোনা, ওর চারপাশে পুলিসী প্রহরার সংখ্যাও বাড়ছে। তবে পুলিস খুনীর কোন সন্ধানই করতে পারছে না। মোনা মাত্র নিজেকে নিরাপদ ভাবতে শুরু করেছে—এই সময় মূর্তিমান আতঙ্কের মত হাজির হলো লোকটা।

সেদিন সন্ধ্যায় মোনার দোরগোড়ায় চওড়া কাঁধের লম্বা এক লোক উপস্থিত হলো। তার পরনে নোংরা, জীর্ণ পোশাক, মুখে কৃত্রিম হাসি, ঠোঁটে সিগারেট। তার পেছনে একটি গাড়ি, ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা।

মোনা আগন্তুককে না চেনার ভান করল। 'কি চাই?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ভণিতা রাখুন, ম্যাম,' বলল লোকটা। 'আমি ফ্রেড টেলর। আমাকে আপনি ভাল করেই চেনেন। আমার পেছনের গাড়িটাকেও।'

নিমিষে মোনার মুখের রক্ত সরে গেল।

'দেখুন, আমি পুলিসের কাছে যেতে পারতাম। বলতে পারতাম এক মহিলাকে আমি চিনি, যিনি আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে হাবক্যাপ ছাড়া ওটাকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

'মি. টেলর, আমি—'

'আপনার ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, মিসেস রোপ। এছাড়াও হাবক্যাপ হারানোর ঘটনাসহ আপনার স্বামীর দশ হাজার ডলার নিয়ে পলায়নের ঘটনাও বেশ রসিয়ে বর্ণনা করেছে ওরা।'

ফ্রেড টেলর মোনাকে প্রায় ঠেলে ভেতরে ঢুকল, একটা চেয়ার টেনে বসল। 'বসে পড়ো, খুকি,' ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলল সে। দাঁত বের করে বলল, 'বসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'কিসের কথা?' চেঁচিয়ে উঠল মোনা।

'হারানো দশ হাজার ডলার সম্পর্কে, হানি। ওখান থেকে আমাকে পাঁচ দিলেই আমি একেবারে বোবা হয়ে যাব। বেশি চাইনি কিন্তু। মাত্র অর্ধেক।' সিগারেট টানতে টানতে টেলর বলল, 'দেখো, আমি খুব ভাল করেই জানি এসব ঘটনা

কিভাবে ঘটে। স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচনা দেয় তার অফিস থেকে টাকা মারতে। দু'জনে মিলে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে। তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে স্ত্রী বলে, 'চলো, দক্ষিণ আমেরিকাটা একবার ঘুরে আসি। কিন্তু স্বামী বেচারার আর দরজার বাইরে পা রাখার সৌভাগ্য হয় না। স্ত্রী তার চোদ্দটা বাজিয়ে দেয়। তারপর সে একাই মজা করতে থাকে।'

'বাহ্, দারুণ গপপো ফাঁদতে জানো দেখছি।' বলল মোনা।

'তাই কি?' হাসল ফ্রেড টেলর, তবে চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। হঠাৎ তার মুখ কঠোর হয়ে উঠল। 'হানি, আমি এখানে গপপো মারতে আসিনি। আমি পাঁচ হাজার ডলার চাই নতুবা পুলিসের কাছে যেতে বাধ্য হব।'

'মি. টেলর, প্লীজ...' অন্ধের মত শব্দ হাতড়াচ্ছে মোনা। কি বলবে বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এই ছিল তার কপালে। 'মি. টে-টেলার,' ঢোক গিলে বলল সে, 'তোমাকে...তোমাকে কি একটা ড্রিঙ্ক দেব? টাকাটা...ইয়ে মানে, আমাকে জোগাড় করতে হবে।'

ফ্রেড টেলরকে বিস্মিত দেখাল, কিন্তু কথাটা তার মনে ধরেছে বোধ হয়। মোনার সর্বাঙ্গে দ্রুত একবার নজর বোলাল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মিসেস রোপ, তোমার কথায় ভরসার গন্ধ পাচ্ছি। তুমি বন্ধু হতে চাইছ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমারও তাতে আপত্তি নেই।'

মোনা রান্নাঘরে ঢুকল। তাকে অনুসরণ করল ফ্রেড টেলর। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে মোনা, তবে একই সঙ্গে ঝড়ের গতিতে মাথা চলছে। এই মূর্তিমান আতঙ্কটার হাত থেকে তাকে রক্ষা পেতেই হবে। সে এক বোতল বুরবন বের করল। ফ্রেড মন্তব্য করল, 'ভাল মাল।' কাবার্ড থেকে দুটো গ্লাস বের করল মোনা, ফ্রিজ খুলল। আইস কমপার্টমেন্টে বরফের কিউবগুলো ট্রের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে আছে। মোনা কিউবগুলো ছোটাতে চেষ্টা করছে, টের পেল ফ্রেড অশ্লীলভাবে তার শরীরের সঙ্গে গা ঠেসে ধরেছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল মোনার। কিন্তু ফ্রেড বলল, 'দেখি, আমি কিউবগুলো নিচ্ছি।' সিধে হয়ে গেল মোনা, কিন্তু ফ্রেড ওর কাঁধ চেপে ধরল, চোখে চিকচিক করছে কামনা। ঝুঁকল ফ্রেড, চুমু খাবে। ঝট করে মুখ সরিয়ে নিল মোনা। এক মুহূর্তের জন্যে ফ্রেডের মুখ ছুঁয়ে গিয়েছিল মোনার চিবুক, বোটকা একটা গন্ধ পেল মোনা। বিদ্যুৎগতিতে হাতটা ওপর দিকে উঠে এল, ঠাস করে ফ্রেডের গালে চড় কষাল সে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল ফ্রেড, কিন্তু মোনাকে অবাক করে দিয়ে ছেড়ে দিল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ফ্রেড মোনার দিকে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

'ঠিক আছে, খুকি। তোমার বন্ধুত্ব তাহলে স্রেফ ভান! যাকগে, টাকাটা আমার এক্ষুণি চাই! বের করো শিগগির।'

মোনা হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

আবার কাঁধ চেপে ধরল ফ্রেড, ভয়ানক ঝাঁকি দিতে লাগল। 'মাগী! টাকা কোথায় রেখেছিস শিগগির বল!' গর্জে উঠল সে।

'গা-গাড়িতে!' ফুঁপিয়ে উঠল মোনা।

ঝাঁকুনি বন্ধ করল ফ্রেড, তীক্ষ্ণ চোখে চাইল মোনার দিকে। মোনা যন্ত্রমানুষের

মত হাঁটতে শুরু করল, ফ্রেড ওর সঙ্গে এগোল। গ্যারেজে চলে এল দু'জনে। মোনা সব কাজ যেন করছে একটা ঘোরের মধ্যে। জানে না কিসের জন্যে সে গ্যারেজে এসেছে, আসলে অবচেতনভাবে ও একটা অস্ত্র খুঁজছিল পশুটাকে শায়েস্তা করতে, ওর হাত থেকে রক্ষা পেতে। গ্যারেজে কি সে রকম কিছু নেই?

শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে মোনা, পাশে দাঁড়ানো ফ্রেড টেলর বলল, 'এই গাড়িতেই তো, নাকি?'

'না ট্রাঙ্কে,' পকেট হাতড়ে চাবি বের করল মোনা, ট্রাঙ্ক খুলল। খোলা ট্রাঙ্কটা মুখ ব্যাদান করল মোনার দিকে চেয়ে, ওটার মধ্যে জ্যাক আর লাগ রেঞ্চটা পড়ে আছে।

'খুকি...'

কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল ফ্রেড। দেখল মোনা ট্রাঙ্কের মধ্যে কি যেন খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। এবার কি একটা ধরে টানতে শুরু করল মোনা, ছোটাতে পারছে না।

ফ্রেড মোনার কোমরে হাত রাখল, প্রায় ছুঁড়ে ফেলল গ্যারেজের দরজার ওপরে।

'টাকাটা এখানে আছে, খুকি?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে। 'লাইনিং-এর পেছনে?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মোনা।

ফাঁদে পা দিল ফ্রেড টেলর। ট্রাঙ্কের মধ্যে উঁকি দিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল, লাইনিং ছিঁড়তে শুরু করল। টায়ার রেঞ্চটা মোনার সাহায্যে আসার জন্যেই যেন অদূরে অপেক্ষা করছিল। সামনে বাড়ল মোনা, ঝট করে তুলে নিল লোহার ভারী অস্ত্রটা, শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে মরণ-আঘাত হানল ফ্রেডের মেরুদণ্ডে। আর্তনাদ করে উঠল সে, প্রবল ঝাঁকি খেল শরীর। ট্রাঙ্কের ডালায় প্রচণ্ড জোরে থেঁতলে গেল মাথা। এবার রেঞ্চটা ঘুরিয়ে ফ্রেডের ঊরুর পিছনে মারল মোনা। গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল ফ্রেডের, মাথাটা ট্রাঙ্ক থেকে বের করেছে মাত্র, তৃতীয় আঘাতটা করল মোনা ওর মুখে। তারপর যেন খুনের নেশা পেয়ে গেল ওকে। একের পর এক বাড়িতে ফ্রেডের মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল।

রেঞ্চটা লাশের গায়ে ফেলে ট্রাঙ্ক বন্ধ করল মোনা, হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। ফোঁপানির মত শ্বাস বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে কাজটা করতে পেরেছে মোনা। ট্রাঙ্কের ভেতরে লোকটা আর কখনও তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

টলমল পায়ে ঘরে ফিরল মোনা। জট পাকানো চিন্তা-ভাবনাগুলো গোছাতে চেষ্টা করল। ফ্রেড টেলরের লাশটা কোথাও ফেলতে হবে। নদীতে ফেলা যায়। কিন্তু তেমন কোন নির্জন জায়গা মিলবে কি?

হঠাৎ দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ! ভয়ানক চমকে উঠল মোনা, দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে গেল শরীর। ওঠার শক্তি পাচ্ছে না। আমার বেল বাজল। পারব না, কাঁপতে কাঁপতে ভাবল মোনা, আমি আর পারব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল, গভীর শ্বাস টানল একটা, দাঁতে দাঁত চেপে পা বাড়াল সামনের দরজার দিকে। দরজা

খুলতেই শিঁরদাড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নামতে শুরু করল। চিৎকার দিতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামাল দিল ও। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস চোখ কুঁচকে বলল, 'শুভ সন্ধ্যা, মিসেস রোপ। কোন সমস্যা?'

স্বাভাবিক থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মোনা। 'না,' জবাব দিল সে। কণ্ঠ ভাঙা শোনাল। 'মানে—' মাঝ পথে থেমে গেল সে। তারপর বলল, 'মানে আপনাকে এই সময়ে ঠিক আশা করিনি। ভেবেছিলাম ওই লোকটাই আবার এল কিনা!'

'আচ্ছা?' প্রশ্নবোধক চোখে চাইল ব্যাঙ্কস।

ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা গাড়িটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল মোনা। 'একটা লোক এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। একজন সেলসম্যান। লোকটা ভাল না। আমি ওকে বের করে দেই। আর আপনি যখন বেল বাজালেন, ভাবলাম…ইয়ে মানে ওই লোকটাই বুঝি আবার এসেছে। ওকে আরও কড়া কিছু কথা শোনাবার ইচ্ছে নিয়েই দরজা খুলেছিলাম আমি।'

'হয়তো লোকটা কাছে পিঠে কোথাও থাকতে পারে,' বলল সার্জেন্ট। 'তবে ওখানে গাড়ি পার্ক করা তার উচিত হয়নি।'

'সম্ভবত তাড়াহুড়োয় কাজটা করেছে সে।' বলল মোনা। 'যাকগে, আপনার জন্যে কি করতে পারি, বলুন?'

'তেমন কিছুই না। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়ালে কৃতার্থ হব, মিসেস রোপ।'

'এক্ষুণি দিচ্ছি।'

সার্জেন্টকে রান্নাঘরে নিয়ে এল মোনা, তার এহেন অদ্ভুত অনুরোধে খানিকটা হতচকিত সে। গ্লাসে পানি ঢালল মোনা। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, মোনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে চলে এল। ড্রাইভওয়ের গাড়িটার দিকে আবার চাইল সার্জেন্ট। 'আমি কি ওই সেলসম্যানকে খুঁজে বের করে বলব গাড়িটা এখান থেকে সরিয়ে নিতে?'

'না,' মোনার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। 'থাক, যার গাড়ি সেই সময়মত নিয়ে যাবে। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

'ঠিক আছে, মিসেস রোপ। গুড নাইট। আবার দেখা হবে।'

'গুড নাইট, সার্জেন্ট।'

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কসকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল মোনা। সার্জেন্ট গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দরজা খুলল। রেজিস্ট্রেশন বুকের ওপর চোখ বোলাল, তারপর রাস্তায় উঠল। এদিক ওদিক বার দুই তাকাল সবশেষে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা কালো সেডানে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন মোনার করণীয় কাজ একটাই। কনভার্টিবল গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সার্জেন্ট যদি মোনার কল্পিত সেলসম্যানের জন্যে কোথাও অপেক্ষা করতে থাকে তাহলে সে মোনাকে অনুসরণ করবে না। সে শুধু ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা গাড়িটার দিকে নজর রাখবে। হয়তো সারারাত সে এখানেই থাকবে। ভাড়া করা সেডানও

নড়বে না। পরদিন সহজেই মোনার গল্পটা বিশ্বাস-যোগ্যতা পাবে। এক সেলসম্যান তার ড্রাইভওয়েতে গাড়িটা পার্ক করে তার বাসায় এসেছিল। কিন্তু লোকটাকে পছন্দ হয়নি বলে সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। মোনা ভেবেছে সেলসম্যান হয়তো পড়শীদের কারও বাড়িতে গেছে। না, মোনা জানে না, লোকটা কেন তার গাড়ি নিতে আর ফিরে আসেনি।

মোনা কনভার্টিবলটাকে গ্যারেজ থেকে বের করল, মূল রাস্তায় উঠতে যাচ্ছে, হঠাৎ কালো সেডানটা যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল, মোনা বাধ্য হলো ব্রেক কষতে।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস ওর কাছে এল। খোলা জানালায় ঝুঁকে বলল, 'আপনার বয়ফ্রেন্ডটি কোথায়, মিসেস রোপ?' সার্জেন্টের চেহারা পাথরের মত কঠিন।

মোনা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল স্টিয়ারিং হুইল, সাদা হয়ে গেল আঙুলের গাঁট। 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, সার্জেন্ট।'

'আপনাদের এখানে কোন সেলসম্যান আসেনি, মিসেস রোপ। আর আপনার উঠানে ওটা একটা ভাড়া করা গাড়ি। আমার ধারণা আপনার বাড়িতে একটা লোক লুকিয়ে আছে। অবৈধ সম্পর্ক শুধু পুরুষরাই করে না, কথাটা নিশ্চয়ই জানেন। এটা কি সম্ভব নয় যে আপনিও অনেকদিন ধরে কারও সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছেন? এটাও কি সম্ভব নয় যে আপনি আর আপনার প্রেমিক দু'জনে মিলেই আপনার স্বামীর হত্যা পরিকল্পনা করেছেন? আর এটাও বা অসম্ভব কিযে সেই পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আপনার প্রেমিক প্রবর? এই প্রশ্নগুলো আমাকে ভীষণ তাড়া করছে, মিসেস রোপ।'

'সার্জেন্ট!' খাবি খেল মোনা। 'এসব আপনি কি বলছেন? আমি আজই আপনার বসের সঙ্গে কথা বলব। জানেন আমি তা পারি।'

'জ্বী, মিসেস রোপ,' বলল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস। 'তা আপনি পারেন। ঠিক আছে, লেফটেন্যান্ট পোলিংকে ফোন করুন আর বলুন—'

'ওহ্ সার্জেন্ট, দিস ইজ অ্যাবসার্ড!' ঝট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মোনা।

'আপনার গাড়ির চাবি, প্লীজ।'

'কি?' চিৎকার করে উঠল মোনা।

সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ কনভার্টিবলটাকে পরীক্ষা করল। মোনার হার্টবিট বেড়েই চলল। ট্রাঙ্ক বেয়ে রক্ত পড়ছে না তো? মোনা মনে করতে পারল না ফ্রেডকে হত্যা করার সময় ওর শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল কিনা···

'চাবি, মিসেস রোপ?' হাত বাড়াল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, অপেক্ষা করছে।

হতবুদ্ধি মোনা এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'হতে পারে আপনি আপনার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্ল্যান করেছেন,' বলল সে। 'হতে পারে সে ট্রাঙ্কে লুকিয়ে আছে। ট্রাঙ্কটা তাই আমাকে খুলে দেখতে হবে।'

গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল মোনার, ঘুরে দাঁড়াল, দৌড় দেবে। কিন্তু সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস ওর চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। খপ করে সে মোনার কব্জি ধরে ফেলল,

গাড়ির সঙ্গে ওকে ঠেসে ধরে সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিল গায়ে। খোলা জানালার দিকে হাত বাড়াল সার্জেন্ট, একটানে ইগনিশন সুইচ থেকে খুলে আনল চাবির গোছা, মোনাকে চেপে ধরে নিয়ে এল গাড়ির পেছনে। গোছা থেকে সঠিক চাবিটা বের করে ট্রাঙ্কের তালায় লাগাল ব্যাঙ্কস। তারপর একটানে ডালাটা তুলে ফেলল ওপরে।

ভেতরের দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল সার্জেন্ট ব্যাঙ্কস, আর একই সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল মোনা রোপ।

হিচ-হাইকার

নতুন একটা গাড়ি কিনেছি আমি। বি.এম.ডব্লিউ. মডেলের, হালকা নীল। বেশ বড় গাড়ি, ঘণ্টায় সর্বোচ্চ স্পীড ১২৯ মাইল। বসার সীটগুলো গাঢ় নীল, জেনুইন লেদারে তৈরি। বাটনে চাপ দিলে দরজা আপনা থেকে খুলে যায়, ছাদও তাই। রেডিওর সুইচ অন করলেই এরিয়ালটা খাড়া হয়ে যায়। আর যেই সুইচ অফ করি, অদৃশ্য হয়ে যায় জিনিসটা। গাড়ির ইঞ্জিন দারুণ শক্তিশালী। সম্ভবত এ কারণেই স্লো স্পীডে ওটা রীতিমত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে থাকে। কিন্তু ষাটে উঠলেই ঘোঁৎঘোঁতানি বন্ধ হয়ে যায়। মনে হয় যেন হৃষ্ট চিত্ত বেড়াল গরগর করছে।

গাড়িটা কেনার কয়েকদিন পরে আমি লন্ডনের পথে যাত্রা শুরু করলাম। জুনের ঝকঝকে একটি দিন। রাস্তার দু'পাশে শস্য খেত, সোনালি রঙের ঝুমকো ফুল ফুটে আছে। দেখতে ভালই লাগছে। আমি সত্তর মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছি। সীটে হেলানো গা, হালকা ভাবে হাত দুটো রেখেছি হুইলে। মনের আনন্দে শিস বাজাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল লোকটাকে। রাস্তার ধারে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। থামতে বলছে আমাকে, স্পীড কমিয়ে আনলাম, লোকটার পাশ ঘেঁষে দাঁড় করালাম গাড়ি। হিচ-হাইকারদের লিফট দিতে কখনও আপত্তি করি না আমি। একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাশ দিয়ে অগ্রাহ্য করে ছুটে যাওয়া গাড়ি দেখে নিজেকে কেমন অসহায় লাগে ভালই জানা আছে আমার। দেখেও না দেখার ভান করে যে সব ড্রাইভার তাদের মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করে আমার। বিশেষ করে তিন তিনটে সীট খালি থাকা সত্ত্বেও যারা গাড়ি থামায় না, তাদেরকে।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বড় গাড়ির মালিকরা হিচ-হাইকারদের খুব কমই লিফট দেয়। ছোট, লঝঝরে গাড়ির মালিকরা এসব ব্যাপারে বেশ উদার। আর দেখেছি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যেসব বাবা-মা ঘুরতে বেরোয় তারাও লিফট দিতে কার্পণ্য করে না।

আমার গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিল লোকটা। 'স্যার কি লন্ডনের দিকে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'উঠে পড়ুন।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লোকটা। গাড়ি ছেড়ে দিলাম আমি।

লোকটা ছোটখাট, চেহারাটা ইঁদুরের মত। কালো চোখে সতর্ক এবং ধূর্ত দৃষ্টি। কান জোড়া আগার দিকে সামান্য ছুঁচলো। কাপড়ের একটা ক্যাপ মাথায়। পরনের ধূসর রঙের জ্যাকেটে অনেকগুলো পকেট। ধূসর জ্যাকেট, চকচকে চোখ, ছুঁচলো কান, সব মিলে লোকটাকে আমার কেমন ইঁদুর ইঁদুর মনে হতে লাগল।

'লন্ডনের কোথায় যাবেন আপনি?' জানতে চাইলাম।

'এপসমে,' জবাব দিল সে। 'ঘোড়দৌড় দেখতে। আজ রেস আছে ওখানে।'

'তাই?' বললাম আমি। 'আপনার সাথে যেতে পারলে ভালই লাগত আমার।

রেসে বাজি ধরতে পছন্দ করি আমি।'

'আমি ওসব বাজি টাজি ধরি না,' বলল সে। 'এমন কি ঘোড়াদের দৌড়ও দেখি না। গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে বিশ্রী লাগে।'

'তাহলে ওদিকে কেন যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

লোকটার কপাল কুঁচকে উঠল। মনে হলো অনধিকার চর্চা করে ফেলেছি। মুখ অন্ধকার করে সে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল, বলল না কিছুই।

'আপনি রেসের টিকেট বিক্রি করেন নাকি?' হালকা গলায় প্রশ্ন করলাম।

'ও তো আরও জঘন্য কাজ,' জবাব দিল সে। 'টিকেট বিক্রির মধ্যে কোন মজাই নেই। একটা নির্বোধও ও কাজ ভাল পারে।'

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললাম না। ঠিক করলাম লোকটার কাছে আর কিছু জানতে চাইব না। কোথায় যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? আপনি কি কাজ করেন? বিয়ে করেছেন? গার্ল-ফ্রেন্ড আছে? নাম কি তার? আপনার বয়স কত? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন একজন হিচ-হাইকারকে কি পরিমাণ বিব্রত করে তোলে তা আমার চেয়ে কেউ ভাল জানে না। আগে যখন রাস্তায় কারও লিফট চাইতাম এরকম বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত আমাকে। খুবই রাগ লাগত। এসব আউল-ফাউল প্রশ্নের কোন মানে নেই। আরে বাবা, দয়া করে লিফট দিয়েছ, ব্যস। গন্তব্যে পৌছে দিলে দাও, না হলে নামিয়ে দাও গাড়ি থেকে। হ্যানোত্যানো প্রশ্ন করার কি দরকার?

'দুঃখিত,' বললাম আমি। 'আপনি কি করেন জানতে চাওয়া ঠিক হয়নি আমার। আসলে সমস্যা কি—আমি একজন লেখক। আর লেখকদের বাজে অভ্যেস আছে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর।'

'আপনি গল্প লেখেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'গল্প লেখা ভাল কাজ,' বলল লোকটা। 'দক্ষতা প্রয়োজন, এটাকে আমি সেরকম একটা কাজ বলে মনে করি। আমিও এমন একটা কাজের সাথে জড়িত, যাতে দক্ষতা লাগে। তবে যাদের পেশায় দক্ষতা দেখাবার কিছু নেই সে সব লোকদের আমি দু'পয়সাও দাম দিই না। আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'জীবনের গোপন রহস্য হলো,' বলল সে, 'সবচেয়ে শক্ত কাজে সবচেয়ে ভাল দক্ষতা প্রদর্শন।'

'আপনি নিশ্চয়ই তা করে থাকেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'অবশ্যই। আপনার মতই।'

'আপনি কি করে বুঝলেন আমি আমার পেশায় খুব দক্ষ?' লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে চাইলাম। 'বাজারে তো প্রচুর আজেবাজে লেখক আছেন।'

'নিজের পেশায় খুব ভাল কাজ দেখাতে না পারলে এত বড় গাড়ি আপনি চালাতে পারতেন না,' বলল সে। 'গাড়িটা নিশ্চই খুব দামী।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি।

'সর্বোচ্চ স্পীড কত?'

'ঘণ্টায় একশো ঊনত্রিশ মাইল।'

'উহুঁ, বিশ্বাস হয় না।' এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। 'দামী হলেও গাড়িটা এত স্পীড তুলতে পারবে না।'

'অবশ্যই পারবে।' তীক্ষ্ণ গলা আমার।

'গাড়ির কোম্পানিগুলো বেশিরভাগই মিথ্যাবাদী,' বলল সে। 'বিজ্ঞাপনে যতই বড়াই করুক না কেন, আসল কাজে সব লবডঙ্কা আর ভুয়া।'

'আমার গাড়ি অন্তত ভুয়া নয়,' থমথমে গলায় বললাম আমি।

'তাহলে যাচাই হয়ে যাক,' বলল লোকটা। 'দেখান আপনার গাড়ির কারিশমা।'

জিদ চেপে গেল আমার। অ্যাকসেলারেটরে দাবিয়ে দিলাম পা, ঘোড়ার মত সামনের দিকে লাফ মারল আমার গাড়ি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্পীড উঠে এল নব্বুইতে।

'বাহ্! বাহ্!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'তোফা চলছে! চালিয়ে যান!'

অ্যাকসেলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ল আমার, সেই সাথে বেড়ে চলল গতি।

'একশো!' চিৎকার করতে থাকল হিচ-হাইকার। '...একশো পাঁচ!... একশো দশ!...একশো পনেরো! চালিয়ে যান! থামবেন না!'

বিদ্যুৎ গতিতে অসংখ্য গাড়িকে পাশ কাটাতে লাগলাম আমরা। মনে হলো সবগুলো যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে—একটা সবুজ মিনি, ক্রীম কালারের একটা বড় সিট্রন, সাদা রঙের একটা ল্যান্ডরোভার, কন্টেইনার বোঝাই বিরাট এক ট্রাক, কমলা রঙের একটা ফক্সওয়াগন মিনিবাস...।

'একশো বিশ!' উত্তেজনায় আমার যাত্রী লাফাতে শুরু করল। 'চালান! চালান! একশো ঊনত্রিশে নিয়ে যান!'

ঠিক এই সময় পুলিসের সাইরেন শুনতে পেলাম আমি। এত জোরে, মনে হলো গাড়ির পাশেই যেন শব্দটা বাজছে। পর মুহূর্তে এক পুলিস অফিসারের মটর সাইকেল দেখলাম, আমাদের পাশ কাটাল। হাত তুলে থামতে বলল অফিসার।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠলাম আমি। 'এবার আর রক্ষা নেই!'

পুলিস অফিসার নিশ্চয়ই একশো ত্রিশ মাইল স্পীডে চালাচ্ছিল। কারণ তার বাহনের গতি কমাতে বেশ সময় নিল সে। শেষে রাস্তার ধারে মটর সাইকেল দাঁড় করাল। আমি গাড়ি নিয়ে তার পেছনে চলে এলাম। 'পুলিসের মটর সাইকেল এত দ্রুত চলে জানতাম না,' মৃদু গলায় বললাম আমি।

'এটা পারে,' বলল আমার যাত্রী। 'ওটা আপনার মডেলেরই তো। বি.এম.ডব্লিউ.। রাস্তার রাজা বলে লোকে এই বাইকগুলোকে। আর এই বাইকগুলোই পুলিসের লোকেরা আজকাল ব্যবহার করছে।'

পুলিস অফিসার মটর সাইকেল থেকে নামল। হাতের গ্লাভস খুলে সাবধানে রাখল সীটের ওপর। ধীর গতিতে কাজগুলো করছে সে, কোন তাড়া নেই। বাগে পেয়েছে সে আমাদেরকে।

'সমস্যা হবে মনে হচ্ছে,' বললাম আমি। 'লোকটার ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না।'

'যা জিজ্ঞেস করবে তার অতিরিক্ত কিছু বলতে যাবেন না,' আমার সঙ্গী সতর্ক

করে দিল। 'এখন চুপচাপ বসে থাকুন।'

যেন সিংহ এগিয়ে এল তার সহজ শিকারের দিকে, পুলিস অফিসার ধীরে সুস্থে পা বাড়াল আমাদের লক্ষ্য করে। পেট মোটা লোকটা মাংসের একটা পাহাড়, কাপড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে গোবদা ঊরু। হেলমেটের ওপর গগলস তুলে দিয়েছে, প্রশস্ত থুতনিঅলা মুখটা টকটকে লাল।

স্কুল পালানো ছেলেরা হাতেনাতে ধরা পড়লে যেমন হয়, সেরকম মুখ করে বসে থাকলাম দু'জনে।

'লোকটার চেহারা দেখেছেন?' ফিসফিস করে বলল আমার সহযাত্রী। 'যেন নরক থেকে উঠে এসেছে।'

পুলিস অফিসার গাড়ির খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, মাংসল একখানা হাত রাখল চৌকাঠে। 'এত তাড়া কিসের?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কোন তাড়া নেই, অফিসার,' বললাম আমি।

'মনে হয় আসন্ন প্রসবা কোনও মহিলাকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াচ্ছিলেন?'

'জ্বী না, অফিসার।'

'নাকি আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে আর আপনি আপনার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ছুটছেন?' লোকটার কণ্ঠ ভয়ঙ্কর রকম শান্ত। ঝড় ওঠার পূর্বাভাস।

'আমার বাড়িতে আগুন লাগেনি, অফিসার।'

'তাহলে,' বলল সে। 'আমাকে ধরে নিতে হচ্ছে বেহুদাই আপনি ছোটাছুটি করছিলেন। জানেন, এখানে সর্বোচ্চ গতি সীমা কত?'

'সত্তর,' বললাম আমি।

'তাহলে কি আপনি অনুগ্রহ করে বলবেন কত মাইল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলেন?'

শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। জবাব দিলাম না। যেন বাজ পড়ল গাড়িতে। লাফিয়ে উঠলাম আমি, গলার সব শক্তি একত্র করে চেঁচাতে চেঁচাতে অফিসার বলল, 'ঘণ্টায় একশো উনত্রিশ মাইল বেগে আপনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। স্পীড লিমিটের পঞ্চাশ মাইলেরও ওপরে!'

মুখ ঘুরিয়ে একদলা থুথু ফেলল সে। গাড়ির উইং-এ গিয়ে পড়ল ঘিনঘিনে জিনিসটা, পিছলে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। আবার আমাদের দিকে ফিরল অফিসার, কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল আমার সহযাত্রীর দিকে। 'আপনি কে?' ধারাল গলায় জানতে চাইল সে।

'একজন হিচ-হাইকার,' জবাব দিলাম আমি। 'ওঁকে লিফট দিচ্ছি।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। ওকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আমি কি আপনার কোন সমস্যা করেছি?' গলায় এক পাউন্ড মাখন লাগিয়ে বলল আমার সহযাত্রী।

'তারচেয়েও বেশি,' বলল অফিসার। 'যাক গে, আপনি সাক্ষী হিসেবে থাকবেন। আমি আপনার সাথে একটু পরে কথা বলছি। ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখি।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সে, হাত বাড়িয়ে দিল।

ড্রাইভিং লাইসেন্স তুলে দিলাম আমি অফিসারের হাতে।

বাঁ দিকের ব্রেস্ট পকেট খুলে সে টিকেট দেয়ার বই বের করল। লাইসেন্স থেকে আমার নাম আর ঠিকানা সতর্কভাবে টুকে নিল। তারপর ওটা আবার ফিরিয়ে দিল আমাকে। শরীর মুচড়ে গাড়ির সামনে চলে এল অফিসার, নাম্বার প্লেট দেখল ভাল করে। লিখল নাম্বার। তারিখ, সময় এবং আমার বক্তব্য এক এক করে টুকল সব। তারপর টিকেটের মূল কপিটা ছিঁড়ে নিল বই থেকে। তবে আমাকে দেয়ার আগে ভাল করে কার্বন কপির ওপর নজর বোলাল কোন কিছু বাদ পড়েছে কিনা দেখতে। সব শেষে বইটা টিউনিকের পকেটে রেখে বোতাম আটকাল।

'এবার আপনি।' ঘুরে গাড়ির অন্য পাশে চলে এল অফিসার। অন্য ব্রেস্ট-পকেট থেকে ছোট, কালো রঙের একটা নোটবই বের করল। 'নাম কি?' ধমকে উঠল সে।

'মাইকেল ফিশ,' বলল আমার সহযাত্রী।

'ঠিকানা?'

'চোদ্দ, উইন্ডসন লেন, লুটন।'

'নাম-ঠিকানা আসল কিনা প্রমাণ দেখান,' বলল পুলিস অফিসার।

মাইকেল ফিশ তার অগুনতি পকেট হাতড়াল দ্রুত, তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করে দেখাল, অফিসার নাম আর ঠিকানা পরীক্ষা করে লাইসেন্সটা ফিরিয়ে দিল। 'কি কাজ করেন?' কঠোর গলা তার।

'আমি একজন যোগানদার।'

'কি?'

'রাজমিস্ত্রীর যোগানদার।'

'মানে?'

'মানে আমি রাজমিস্ত্রীর জন্যে…ইঁট, সুড়কি, বালু ইত্যাদি যোগান দিই।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। আপনি কার আন্ডারে কাজ করেন?'

'বিশেষ কারও আন্ডারে না। যার যখন প্রয়োজন পড়ে আমাকে ডাকলেই পায়।'

পুলিস অফিসার মাইকেল ফিশের সব কথা লিখে নিল তার কালো নোটবুকে। বইটা পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম লাগাল।

'থানায় আমার সাথে দেখা করবেন। আপনার আরও কিছু চেকিং-এর দরকার আছে,' বলল অফিসার।

'সেকি! আমি আবার কি করলাম?' ইঁদুর মুখো মাইকেল ফিশ অবাক হলো।

'কিছুই করেননি। কিন্তু আপনার চেহারাখানা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না,' জবাব দিল অফিসার। 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আমাদের ফাইলে যেন আপনার ছবি দেখেছি।' ঘুরে সে আমার জানালার পাশে চলে এল।

'আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আপনি এখন বেশ বিপদের মধ্যে আছেন,' বলল অফিসার।

'জ্বী, তা বুঝতে পারছি,' বললাম আমি।

'আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বাহারে গাড়ি আপনি চালাতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, অনেক দিন কোন গাড়ি চালাবার সুযোগই আপনার

হবে না। 'আর আশা করি অহেতুক তর্কাতর্কির দায়ে ওরা আপনাকে শ্রীঘরে ঢোকাবে।'

'তার মানে জেলখানায়?' সাবধানে প্রশ্ন করলাম আমি।

'জ্বী, হ্যাঁ,' টাকরায় অদ্ভুত একটা শব্দ করল সে, 'গারদ খানায়। অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে আপনাকে ওখানে ঢোকানো হবে। আর বেশি কথা বলার জন্য জরিমানা তো হবেই। আর আদালতে আপনাদের দু'জনের সাথে দেখা হলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। তা যাতে হয় সে ব্যবস্থা আমি করব।'

ঘুরে দাঁড়াল মোটু। থপথপিয়ে এগোল তার মটরসাইকেলের দিকে। চড়ে বসল। তারপর গর্জন তুলে একটু পরেই চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

'ফু!' সশব্দে শ্বাস ফেললাম আমি। 'ব্যাটা ঠিকই আমাদের কোর্টে হাজির করবে।'

'আপনি এখন কি করবেন, স্যার?' জানতে চাইল মাইকেল ফিশ।

'লন্ডন পৌঁছেই আমার আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করব,' বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম আমি।

'ও জেলে ঢোকাবে বলল আর আপনি তা বিশ্বাস করে বসলেন?' বলল মাইকেল ফিশ। 'স্রেফ স্পীড বাড়ানোর দায়ে কখনও জেল হয় না।'

'আপনি ঠিক জানেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অবশ্যই,' মাথা দোলাল সে। 'এর শাস্তি বড় জোর লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে মোটা অঙ্কের জরিমানা। ব্যস, ওখানেই ঘটনা শেষ।'

শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। 'আচ্ছা,' প্রশ্ন করলাম আমি, 'ওকে আপনি মিথ্যা বললেন কেন?'

'কে, আমি?' বলল ফিশ। 'কি মিথ্যা বলেছি?'

'এই যে বললেন আপনি রাজমিস্ত্রীর যোগানদার। কিন্তু আপনিই তো একটু আগে বললেন আপনি নাকি খুব ভাল একটা পেশার সাথে জড়িত?'

'আসলেও তাই,' বলল সে। 'কিন্তু ঠোলাদের কাছে সব কথা বলতে নেই।'

'আমাকে বলতে আপত্তি আছে?' মাইকেল ফিশ ইতস্তত করছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতে লজ্জা পাচ্ছেন নাকি?'

'লজ্জা?' চিৎকার করে উঠল ফিশ। 'আমি লজ্জা পাব? তাও আমার পেশা নিয়ে? সবচেয়ে সেরা পেশার মানুষটির চেয়ে আমার কাজ কোন অংশে কম গর্বের নয়।'

'তাহলে বলতে চাইছেন না কেন?'

'আপনারা, লেখকরা বড় বেশি জিদ্দি।' বলল সে। 'আসল কথা না জানা পর্যন্ত শান্তি নেই মনে।'

'বললে বলবেন, না বললে না-ই!' অনাগ্রহের ভান করলাম আমি।

চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকাল ফিশ। 'মুখে বললেও বুঝতে পারছি ভেতরে ভেতরে আপনি ঠিকই আগ্রহে মরে যাচ্ছেন।'

ধরা পড়ে লজ্জা পেলাম। কিন্তু চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

'তবে আমার পেশাটা সত্যি অদ্ভুত,' বলল মাইকেল ফিশ। 'পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত পেশার লোক আমি।'

চুপ করে থেকে লোকটাকে কথা বলতে দিলাম।

'আর এজন্য আমাকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। আমার পেশার কথা আপনাকে বলতে পারি। তার আগে বলুন আপনি সাদা পোশাকে কোন টিকটিকি নন তো?'

'আমাকে কি টিকটিকির মত দেখায়?'

'তা অবশ্য দেখায় না,' স্বীকার করল ফিশ।

পকেট থেকে তামাকের কৌটা আর সিগারেট পেপারের প্যাকেট বের করল সে। সিগারেট বানাতে শুরু করল। চোখের কোণ দিয়ে তার কার্যকলাপ দেখছি আমি। মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে সিগারেট বানিয়ে ফেলল সে। এত দ্রুত গতি জীবনেও দেখিনি আমি। কাগজের দুই কিনারে আলতোভাবে জিভ দিয়ে স্পর্শ করল ফিশ, কাগজটা মুড়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজল। যেন শূন্য থেকে একটা লাইটার চলে এল তার হাতে। সিগারেটে আগুন ধরাল। আবার চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল লাইটারটা। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে কাজটা করল সে।

'এত দ্রুত সিগারেট বানাতে আগে কখনও দেখিনি,' বললাম আমি।

'আচ্ছা।' জোরে ধোঁয়া টানল ফিশ। 'আপনি তাহলে আমাকে লক্ষ করছিলেন।'

'লক্ষ করব না, বলেন কি! এ তো অসাধারণ একটা ব্যাপার।'

পেছনে হেলান দিল সে, মুচকি হাসি ঠোঁটে। 'কি করে এত দ্রুত কাজ করলাম জানতে ইচ্ছে করে না?' প্রশংসায় খুশি হয়েছে ফিশ।

'অবশ্যই।'

'দ্রুত কাজ করতে পারি আমার এই অসাধারণ আঙুলগুলোর জন্যে।' হাত জোড়া উঁচু করে দেখাল সে। 'পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা পিয়ানো বাদকের চেয়েও এই হাতের মুভমেন্ট অনেক বেশি দ্রুত।'

'আপনি তাহলে পিয়ানো বাজান?'

'দূর, কি যে বলেন!' বলল ফিশ। 'আমার চেহারা পিয়ানো বাদকের মত নাকি?'

আমি ফিশের আঙুলের দিকে তাকালাম। লম্বা, সরু খুব সুন্দর দশটা আঙুল। মানুষটার চেহারার সাথে আঙুলগুলোর অভিজাত আকৃতি কিছুতেই মেলে না। যেন ব্রেন সার্জন কিংবা ঘড়ি নির্মাতার হাত হলেই বেশি মানাত।

'আমার কাজ,' বলে চলল সে, 'পিয়ানো বাজানোর চেয়েও অনেক কঠিন। যে কেউ পিয়ানো শিখতে পারে। আজকাল তো পিচ্চিপাচ্চাগুলোও একেকজন ওস্তাদ পিয়ানো বাদক। তাই না?'

'কম বেশি অনেকেই,' সায় দিলাম।

'কিন্তু আমার যে কাজ তা দশ লক্ষেও একজন পারবে কিনা সন্দেহ। ভুল বললাম, এক কোটিতেও একজন। শুনে কেমন মনে হচ্ছে?'

'দারুণ,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ। আমার পেশাটাকে দারুণ বলতেই হবে,' আত্মতুষ্টি ফিশের কণ্ঠে।

'আমার মনে হয় আপনার পেশার রহস্যটা আমি ধরে ফেলেছি,' উৎসাহী গলায় বললাম আমি। 'আপনি জাদুর খেলা দেখান। আপনি একজন জাদুকর, না?'

'আমি?' নাক কোঁচকাল সে। 'খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই, বাচ্চাদের পার্টিতে গিয়ে জাদু দেখাব!'

'তাহলে আপনি তাসের রাজা। তাস খেলায় বিভিন্ন ট্রিকস দেখিয়ে লোকজনকে বোকা বানান।'

'দূর দূর!' আহত হলো ফিশ। 'তাস পেটার মত বিশ্রী জিনিস দুনিয়ায় আর দু'টি নেই।'

'তাহলে আর বলতে পারছি না।' হাল ছেড়ে দিলাম আমি।

গাড়ি এখন বেশ আস্তে চালাচ্ছি আমি। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল স্পীডে। কারণ চাই না পথে আবার কোন ইউনিফর্মধারী আমাদের থামাক। আমরা লন্ডন-অক্সফোর্ডের মূল রাস্তায় চলে এসেছি। এখন ডেনহ্যামের দিকে চলেছি।

হঠাৎ মাইকেল ফিশ কালো চামড়ার একটা বেল্ট দেখাল আমাকে। 'জিনিসটা কখনও দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে। বেল্টের ব্রাশ বাক্‌লে অদ্ভুত ডিজাইন।

'আরে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এটা তো আমার বেল্ট! আপনি পেলেন কোথায়?'

মুচকি হাসল সে। এদিক ওদিক বেল্টটা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আপনার কি ধারণা, কোত্থেকে পেয়েছি?' অবশ্যই আপনার ট্রাউজারের ওপরের অংশ থেকে।'

সাথে সাথে কোমরে হাত চলে গেল আমার। বেল্টটা নেই। 'গাড়ি চালানোর সময় কাজটা করেছেন নিশ্চয়ই?' বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল সে। কুঁতকুঁতে চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে।

'তা কি করে সম্ভব।' বিস্মিত ভাবটা এখনও কাটেনি আমার। 'বেল্ট খুলতে হলে আগে আপনাকে বাক্‌ল খুলতে হয়েছে। তারপর সবগুলো লূপ দিয়ে জিনিসটাকে টেনে বের করতে হয়েছে। অথচ আমি দেখা দূরে থাক, টেরই পাইনি।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল মাইকেল ফিশ। বেল্টটাকে কোলে ফেলল, ভোজবাজির মত তার আঙুলের ফাঁকে চলে এল বাদামী রঙের জুতোর ফিতে। 'আর এটা কার, জনাব?' ফিতেটা নাড়তে লাগল সে আমার মুখের সামনে।

'কার মানে?' বললাম আমি।

'এখানে কারও জুতোর ফিতে চুরি গেছে কি?' ঠোঁটে মুচকি হাসিটা ধরাই আছে ফিশের।

চট করে জুতোর দিকে নজর চলে গেল আমার। এক পায়ের জুতোর ফিতে উধাও। 'মাই গড!' রীতিমত আঁতকে উঠলাম আমি। 'এ কি করে হলো? আমি তো আপনাকে মাথা নিচু করতেই দেখিনি।'

'আপনি কিছুই দেখেননি,' অহঙ্কারী গলায় বলল ফিশ। 'আপনি আমাকে এক ইঞ্চি এদিক ওদিক নড়তে দেখেননি। কেন জানেন?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'আপনার ওই অসাধারণ আঙুলগুলোর জন্যে।'

'একেবারে ঠিক বলেছেন,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ব্যাপারটা খুব দ্রুত ধরে

ফেলেছেন আপনি।' সীটে হেলান দিল মাইকেল ফিশ, হাতে বানানো একটা সিগারেট ধরাল। উইন্ডশিল্ডের দিকে ছুঁড়ে দিল ধোঁয়ার হালকা একটা স্রোত। আমাকে দুটো ট্রিকস দেখিয়ে বোকা বানিয়ে মজায় আছে সে। 'ক'টা বাজে বলুন তো?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে।

'সামনেই তো ঘড়ি আছে,' বললাম আমি।

'গাড়ির ঘড়ির প্রতি আমার কোন আস্থা নেই,' বলল সে। 'আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে?'

কব্জির আস্তিন গোটালাম সময় দেখার জন্যে। নেই। ঘড়িটাও উধাও। ফিশের দিকে ঝট করে তাকালাম। আমার চোখে চোখ রেখে হাসল সে।

'ঘড়িটাও নিয়ে নিয়েছেন!' বললাম আমি।

হাত বাড়াল ফিশ। মুঠো খুলল। তালুতে আমার রিস্টওয়াচ। 'আপনার ঘড়িটা খুব সুন্দর,' মন্তব্য করল সে। 'দামী এবং ভাল কোয়ালিটির। আঠারো ক্যারেট গোল্ড আছে এটাতে। সহজেই হাতে পরা যায়। খোলাও যায়। আসলে ভাল জাতের জিনিস খুলে নিতে সমস্যা হয় না।'

'কিছু মনে না করলে ঘড়িটা আমাকে ফিরিয়ে দেন,' ম্লান গলায় বললাম আমি।

সামনে, চামড়ার একটা ট্রে-র ওপর ঘড়িটা যত্নের সাথে রেখে দিল মাইকেল ফিশ, বলল, 'আমি আপনার কোন জিনিস মেরে দেব না, স্যার। কারণ আপনি এখন আমার বন্ধু। লিফট দিয়ে আমার বেশ বড় উপকার করেছেন।'

'শুনে খুশি হলাম,' শুকনো কণ্ঠ আমার।

'এখন আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেব,' বলল ফিশ। 'আপনি আমার পেশার কথা জানতে চেয়েছিলেন। তা এখন বলব।'

'আপনি আমার কাছ থেকে আর কি কি জিনিস নিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আবারও হাসি ফিরে এল তার মুখে। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটার পর একটা জিনিস বের করতে লাগল সে। সবগুলোই আমার জিনিস—ড্রাইভিং লাইসেন্স, চারটে চাবিসহ চাবির রিঙ, কয়েকটা পাউন্ড, কিছু কয়েন, আমার প্রকাশকের একটা চিঠি, ডায়েরী, ভোঁতা একটা পেন্সিল, সিগারেট লাইটার, আর সবশেষে মুক্তো বসানো আমার স্ত্রীর অপূর্ব সুন্দর নীলকান্তমণির আংটিটি। আমি আংটিটা নিয়ে লন্ডনের এক জুয়েলারীতে যাব ঠিক করেছিলাম। ওটার একটা মুক্তো হারিয়ে গেছে।

'এই জিনিসটাও খুব সুন্দর,' আঙুলে আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল মাইকেল ফিশ। 'এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর আংটি। আমার ধারণা জিনিসটা রাজা তৃতীয় জর্জের আমলের।'

'ঠিক বলেছেন।' লোকটার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ আমি। 'একদম ঠিক।' অন্য জিনিসগুলোর সাথে আংটিটাও সে চামড়ার ট্রে-তে রেখে দিল।

'তাহলে আপনার কাজ হচ্ছে মানুষের পকেট কাটা,' বললাম আমি।

'শব্দটা পছন্দ হলো না আমার,' প্রতিবাদ করল মাইকেল ফিশ। 'পকেট কাটা বা পকেট মারা কথাটাই কর্কশ এবং অশ্লীল। এ লাইনে অপেশাদার লোকদের

আমরা পকেটমার বলি। এরা বড়জোর অন্ধ মহিলাদের পকেট কাটার সামর্থ্য রাখে।'

'তাহলে কি সম্বোধন করলে আপনি খুশি হন?'

'আমি? আমি একজন আঙুল শিল্পী। পেশাদার আঙুল শিল্পী।' গর্ব ফুটে উঠল তার কণ্ঠে, যেন সে রয়েল কলেজ অভ সার্জনস-এর প্রেসিডেন্ট কিংবা ক্যান্টারবারির বিশপ।

'এ ধরনের সম্বোধন জীবনেও শুনিনি,' বললাম আমি। 'নিজের আবিষ্কার বুঝি?'

'তা কেন হবে,' বলল সে। 'এই পেশায় যারা সবচেয়ে দক্ষ তাদের ''আঙুল শিল্পী'' বলে সম্বোধন করা হয়। আমি আঙুলের কাজে সিদ্ধ হস্ত। তাই আমি আঙুল শিল্পী।'

'কাজটা নিঃসন্দেহে ইন্টারেস্টিং।'

'অসাধারণ বলুন,' বলল মাইকেল ফিশ।

'তাহলে আঙুলের কাজ করতেই আপনি ঘোড়দৌড় দেখতে যাচ্ছেন, তাই না?'

'রেসে কাজটা করা খুব সহজ,' বলল সে। 'রেস শেষ হবার পরে আপনি নিজে তার ওপর নজর রাখুন। এবং সুযোগ বুঝে তার টাকাটা হাতিয়ে কেটে পড়ুন। আর যে লোক সবচে' বেশি টাকা পেয়েছে তার পেছনে লেগে থাকুন। তারপর চান্স পেলেই··· কিন্তু তাই বলে আমাকে ভুল বুঝবেন না, স্যার। আমি হারু পার্টিদের টাকা কখনও মারি না, গরীবদেরটাও না, আমি শুধু ধনী লোকদের পকেট খালি করি।'

'সে আপনার অভিরুচি,' বললাম আমি। 'কিন্তু এ পর্যন্ত ধরা খেয়েছেন ক'বার?'

'ধরা?' অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মাইকেল ফিশ। 'আমি খাব ধরা! ধরা খায় শুধু পকেটমাররা। আঙুল শিল্পীদের টিকিও কেউ ছুঁতে পারে না। শুনুন, আমি চাইলে মুখ থেকে আপনার নকল দাঁতও খুলে আনতে পারি, টেরও পাবেন না।'

'আমার নকল দাঁত নেই,' বললাম আমি।

'আমিও জানি নেই,' বলল সে। 'থাকলে অনেক আগেই হাতিয়ে নিতাম।'

কথাটা বিশ্বাস হলো আমার। ওই লম্বা, মসৃণ আঙুলগুলো যা খুশি তাই করতে পারে।

বেশ খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বললাম না। চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গেলাম।

'পুলিশ অফিসারটা তো আপনার সম্পর্কে ঠিকই খোঁজ-খবর নেবে,' একসময় বললাম আমি। 'ভাবছেন না ব্যাপারটা নিয়ে?'

'কেউ আমার ব্যাপারে খোঁজ নেবে না,' জবাব দিল ফিশ।

'অবশ্যই নেবে। অফিসার তার কালো নোট বইতে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে নিয়ে গেল। নিজের চোখে দেখলাম।'

ধূর্ত হাসি ফুটল ইঁদুর মুখে। 'তাই, না?' বলল সে। 'কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি লোকটার স্মৃতিতে আমার কথা একদম নেই। আমি কখনও শুনিনি ঠোলাদের

স্মৃতি শক্তি খুব ভাল হয়। অনেকে তো নিজের নামও মনে রাখতে পারে না।'

'স্মৃতিশক্তি দিয়ে কি হবে?' বললাম আমি, 'তার তো মনে রাখার দরকার নেই। নাম-ঠিকানা সবই তো লেখা আছে নোট বুকে।'

'হ্যাঁ, স্যার। তা আছে। কিন্তু সমস্যা হলো সে তার নোটবইটা হারিয়ে ফেলেছে, সাথে টিকেট বুকটাও। যেটার মধ্যে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ছিল।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম ফিশের ডান হাতে ধরা আছে পুলিস অফিসারের সেই নোট বুক দুটো। হাতিয়ে নিয়েছে অফিসারের পকেট থেকে।

'এত সহজ কাজ জীবনে করিনি আমি,' সগর্বে ঘোষণা করল মাইকেল ফিশ।

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'ঠোলা ব্যাটা এখন আর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ আমার ধারণা ওই লোকের স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল।'

'আপনি সত্যি একটা জিনিয়াস!' মুগ্ধকণ্ঠে বললাম আমি।

'ঠোলার কাছে এখন আমাদের কারও নাম নেই, নেই ঠিকানা, গাড়ির নাম্বার কিংবা অন্য কিছু,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে চলল সে, 'নেই!'

'আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমান!'

'আমার মনে হয় কিছুক্ষণের জন্যে গাড়িটা থামালে ভাল করবেন আপনি,' বলল মাইকেল ফিশ। 'এই জঞ্জাল দুটো যত তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল।'

'আপনার তুলনা নেই,' বললাম আমি।

'ধন্যবাদ, স্যার,' নড় করল আঙুল শিল্পী। 'প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে, বলুন?'

প্রতিশোধ

গতকাল মরিস সাহেবের পঞ্চাশতম জন্মদিন চলে গেছে। রাবাতে, কিছু ফরাসী বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দিনটি মোটামুটিভাবে পালন করেছেন তিনি। তাঁর পরিচিত লোকের অভাব নেই। তবে এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যককেই তিনি বন্ধু মনে করেন। কারণ যারা তাঁকে অস্থানে-কুস্থানে উদ্ভট সব প্রশ্ন করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় তারা আর যাই হোক, বন্ধু হবার যোগ্যতা রাখে না। এখন বেশ তাজা মন নিয়ে তানজিয়ারের উদ্দেশে সিত্রো চালাচ্ছেন মি. মরিস। মরক্কো দেশটা বসবাসের জন্যে নেহায়েত খারাপ নয়। জৈবিক চাহিদা মেটাতে সুন্দরী মেয়েদের অভাব নেই কোন, চাইলে হাতের কাছে কম-বয়েসী ছেলে-ছোকরাও জুটে যায়। মরিস সাহেবের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা। কামাচ্ছেন ভালই। তবে মাঝে মাঝে স্বদেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে যে মন চায় না তা নয়। কিন্তু এখানে পঁচিশ বছর কাটানোর পরেও দেশে ফেরাটা ঝুঁকিপূর্ণ মনে হওয়াতে তিনি ওদিকে পা বাড়াতে সাহস পান না।

দোষটা যে মরিস সাহেবের একার ছিল এমন নয়। এডওয়ার্ডও এ জন্যে কম দায়ী নয়। পার্টনার শিপে ব্যবসা করতেন দু'জনে, ক্লায়েন্টের টাকা নিয়ে জুয়ো খেলেছিলেন দু'জনে মিলেই। সময় পেলে টাকাটা শোধ করাও যেত। তবে মরিস সাহেবের ভাগ্য ভাল, ডিরেক্টর অভ পাবলিক প্রসিকিউশনসের অফিসে তাঁর এক বন্ধু ছিল। সে-ই তাঁকে বিপদটা সম্পর্কে আগেভাগে সতর্ক করে দেয়। নষ্ট করার মত সময় হাতে আদৌ ছিল না। এমনকি এডওয়ার্ডকে সাবধান করার সময় পর্যন্ত তিনি পাননি, মাছ ধরতে সে স্কটল্যান্ডের পশ্চিমে যাবার কারণে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব তল্পিতল্পা গুছিয়ে কেটে পড়াই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। ক্লায়েন্টদের এডওয়ার্ডই সামলাতে পারবে, মনকে এমন প্রবোধ দিয়ে তিনি তখনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন। তারপর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। নতুন জীবন শুরু এবং স্থিতির জন্যে যথেষ্ট সময়। এখনও মাঝে মাঝে এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে তাঁর। মধ্যবিত্ত পরিবারের এডওয়ার্ড এতদিনে হয়তো বিয়েশাদী করে ঘর বেঁধেছে। বাচ্চা-কাচ্চাও হয়তো আছে। মরিস সাহেবের কানে আবছামত এসেছিল এডওয়ার্ড কোন এক শহরতলির উপকণ্ঠে এখন ডেরা বেঁধেছে। ক্লায়েন্টদের টাকা মেরে দেয়ার হ্যাপা নিশ্চই তাকে আর পোহাতে হয় না। কিন্তু জ্বলন্ত উনুনে তাকে ফেলে এসে যে অন্যায় কাজটি মরিস সাহেব করেছেন, তার কথা কি এডওয়ার্ড ভুলতে পেরেছে এতদিনে? নাকি প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে সে আজও? মনে হয় না। কারণ এডওয়ার্ডকে যতদূর চেনেন মি. মরিস, অত্যন্ত নরম মনের মানুষ সে।

একটা ফিলিং স্টেশনের সামনে গাড়ি থামালেন মি. মরিস। পেট্রল দরকার। রাস্তাটা সাগর উপকূল ধরে সমান্তরাল চলে গেছে। খুবই শান্ত এবং মনোহর পরিবেশ; জীবন আসলে এমন হওয়াই উচিত। জীবনের অর্ধেক পথ পার হয়ে এসে

মরিস কি আবার তাঁর বিশ বছর বয়সের স্মৃতিচারণ শুরু করলেন নাকি? মৃদু হাসলেন তিনি, চোখ চলে গেল ফিলিং স্টেশন থেকে হাত কয়েক দূরে একটা সাইন-পোস্টের দিকে। ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আবা রিসা নামে একটা জায়গার নাম নির্দেশ করছে ওটা। গ্রামটাতে মুসলমানদের জন্যে বিখ্যাত একটি মসজিদ আছে। ওখানে এর আগে বার কয়েক ঢুঁ মেরেছেন মি. মরিস। ঘড়িতে চোখ বোলালেন তিনি; মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। তানজিয়ারে পৌছে ডিনার সারার মত অঢেল সময় আছে হাতে। প্রয়োজনে আরসিলাতেও রাতের খাবার খেয়ে নিতে পারবেন তিনি। ইংরেজ ব্যাটার রেস্তোরাঁর খাবার সুস্বাদুই বটে। সুদর্শন চেহারার বারবার গ্যারেজ কর্মচারীটিকে মাত্রাতিরিক্ত বকশিশ দিয়ে পাশের রাস্তায় সিত্রোঁ ঘোরালেন মি. মরিস।

মরক্কোর রাস্তায় আধ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পরে (ঘণ্টায় এখানে বিশ মাইলের ওপর স্পীড তোলা কিছুতেই সম্ভব নয়।) এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন মি. মরিস যে আবা রিসা ডানে নাকি বাঁয়ে কিছুতেই ঠাহর করত পারলেন না। রাস্তার দু'ধারে বার কয়েক ভালভাবে চোখ বোলানোর পরে মনে হলো বাঁয়ে যেন পাথরের বোল্ডারের সংখ্যা কম। কাজেই ওদিকে যেতে মনস্থির করলেন তিনি। কিন্তু খানিক পরে তাঁর রীতিমত আফসোস হতে লাগল মরতে কেন এদিকের রাস্তা বেছে নিয়েছেন। রাস্তাটা হঠাৎ সরু একটা বাঁকের দিকে মোড় নিয়েছে যেখানে ক্যাকটাসের বিশাল এবং ঘন ঝোপ না পেরিয়ে চলা অসম্ভব। ওদিকে গোটা কয় ছাগল আর দূরে কয়েকটা উট ছাড়া প্রাণের চিহ্নও নেই কোথাও। প্রবল গরমে ঘামতে ঘামতে বিরক্ত মরিস অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিলেন। সাথে সাথে বিকট একটা ধাতব শব্দ হলো, প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে সিত্রোঁ গোঁয়ার-গোবিন্দের মত মাটি কামড়ে থাকল।

ড্রাইভার হিসেবে মরিস সাহেবের সুখ্যাতি থাকলেও তিনি গাড়ি মেরামতির কিছুই জানেন না। সিত্রোঁর সমস্যার কথা জানলেও তা সমাধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। নিজেকে খানিকক্ষণ ইচ্ছেমত গালিগালাজ করে গাড়ির সাইড পকেট খুলে ব্র্যান্ডির একটি ফ্লাস্ক বের করলেন মি. মরিস। অল্প মদ গিলে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলেন নিজের অবস্থার কথা। তাঁর কাছে একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেলযে, দুটো বিকল্প আছে এখন হাতে। হয় তাঁকে পনেরো কিলোমিটার রাস্তা আবার হেঁটে মূল তানজিয়ারবাবাত রোডে ফিরতে হবে। নয়তো নষ্ট গাড়ির মধ্যে বসে থেকে প্রার্থনা করতে হবে যেন শীঘ্রি কোন গাড়িওয়ালার চোখে পড়ে যান যে অন্তত গাড়ির কল-কজা বুঝতে পারে। প্রথম বিকল্পটা তার পছন্দ হলো না। পনেরো মাইল ফিরতি রাস্তা হাঁটতে হবে ভাবতেই শিউরে উঠলেন তিনি। কারণ এমনিতেই বিশাল বপু তাঁর, তার ওপর নিয়মিত মদ আর মেয়েমানুষের নেশা শরীরটাকে আস্তাকুঁড় বানিয়ে ছেড়েছে। শেষ কবে গাড়ি ছাড়া হেঁটেছেন মনে পড়ল না তাঁর। আর দুঃস্বপ্নের মত এই রাস্তায় অকেজো একটা গাড়ির মধ্যে বসে রাত কাটানোর চিন্তাও তাঁকে অসুস্থ করে তুলল। ছাগলগুলো অন্ধকার নামার সাথে সাথে আবার হিংস্র হয়ে উঠবে না তো?

মি. মরিস অনিচ্ছাসত্ত্বেও শরীরটাকে টেনে তুললেন নরম গদি থেকে। ফিরতি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি, জনমানবহীন এই রাস্তায় একা পড়ে থাকার চেয়ে সেটাই ভাল। আর এই সময়, যেন মিষ্টি কোন বাজনার মত, কানে ভেসে এল দূরাগত গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ। সরু মোড়ের মাথায় একটি ল্যান্ড-রোভারের গাটাগোট্টা আকৃতি ফুটে উঠল প্রথমে, তারপর ওটা এসে থামল মি. মরিসের পঞ্চাশ গজ সামনে। নেমে এল ড্রাইভার। মরিসের মনে হলো লোকটার বয়স তাঁরই মত, বারবার ফ্যাশনের পোশাক পরনে। সে এগিয়ে এসে নিখুঁত ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, 'আমি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'থ্যাঙ্ক গড! আমি তো ভেবেছিলাম সারারাত আমাকে এখানে একাই কাটাতে হবে।'

'এই রাস্তাটার কথা আপনার জানা উচিত ছিল।'

'রাস্তা!'

'হ্যাঁ। যাহোক, বলুন কি সমস্যায় পড়েছেন?'

'সমস্যাটা ধরতে পারছি না। মেকানিক হিসেবে একেবারেই বাজে আমি।'

লোকটা দ্রুত গাড়িটাকে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, 'এ গাড়ি আপাতত চলবে না। ব্যাক আক্সেলটা একেবারে গেছে।'

'এখানে ধারে-কাছে গ্যারেজ নেই?' মুখ বিকৃত করে জানতে চাইলেন মি. মরিস।

'না, নেই। গাড়িটাকে এখানেই রেখে যেতে হবে।'

'কোথায় যাব?'

'আপনার আপত্তি না থাকলে আজ রাতে আমার অতিথি হতে পারেন। কাল ভোরে হয়তো মেকানিক জোগাড় করতে পারব।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মরিস সাহেব। আগন্তুকের সাথে হাত লাগিয়ে, সিত্রোঁকে ঠেলে ক্যাকটাসের ঝোপের আড়ালে নিয়ে রাখলেন। 'আপনার উপকারের কথা সত্যি ভুলতে পারব না,' ল্যান্ড-রোভারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন মি. মরিস।

'আপনি তো মি. মরিস অ্যাসটিড, তাই না?'

দাঁড়িয়ে পড়লেন মরিস। 'আরে, আমার নাম জানলেন কি করে?'

'এদিকে আপনাকে অনেকেই চেনে। তানজিয়ারের আমদানী-রপ্তানীকারক হিসেবে জানে। তাছাড়া পঁচিশ বছরেই একটা মুখ কি পুরোপুরি ভোলা যায়?'

'মানে?'

'অবশ্য এই সাজ-পোশাকে আমাকে না চেনারই কথা। এখানকার আবহাওয়ায় যদিও এটা মানিয়ে গেছে। যাহোক, নাম আমার এডওয়ার্ড ফিনলে।'

'এডওয়ার্ড ফিনলে?'

'আগে ছিলাম অ্যাসটিড অ্যান্ড ফিনলে কোম্পানিতে, এস্টেট ব্রোকার হিসেবে।'

এক মুহূর্ত মুখে কোন কথা যোগাল না মরিস সাহেবের। যদিও এতদিন পরে তাঁর মনে কোনই অনুতাপবোধ নেই, তারপরও বললেন, 'আমি দুঃখিত।'

'পঁচিশ বছর পরে? এতদিন কারও মাঝেই দুঃখবোধ থাকে না। বাদ দাও; ভুলে যাও ওসব। চলো, বাড়ি ফেরা যাক।'

নীরবে দু'জনে উঠলেন ল্যান্ড-রোভারে, সিত্রোকে পাশ কাটিয়ে গাড়ি ছুটল।

আধ ঘণ্টায় প্রায় পনেরো কিলোমিটার পথ পার হলেন ওঁরা। সূর্য তখন আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবতে শুরু করেছে। রৌদ্রদগ্ধ সমতল ভূমির মাঝখানে দৃশ্যমান হলো ঝোপঝাড়ে ভরা ছোট্ট একটি টিলা। এডওয়ার্ড ওদিকে হাত তুললেন। 'ওই যে আমার বাড়ি।'

এখনও আঘাতটা সামলে উঠতে পারেননি মি. মরিস, শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে কি করছ?'

'খামার বাড়ি করেছি একটা। কমলা লেবু, ভুট্টা, জলপাই ইত্যাদির চাষ করি। ছোটখাট একটা মরুদ্যান বলতে পারো এই মরুভূমির দেশে। ফ্রেশ পানির জন্যে ঝর্ণাও আছে। এখানকার বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের ওপর বহুদিন ধরে একটা বই লেখার চেষ্টা করছি। যদিও ওটা কোনদিন প্রকাশ হবে না, জানি।'

চুপ হয়ে থাকলেন মরিস। কাঠের গেট পেরুল ল্যান্ড-রোভার। বাঁয়ে ছোট্ট একটা বাড়ি, গেস্ট হাউসের মত। এডওয়ার্ড কি ওখানে ঘুমায়, ভাবলেন তিনি। তারপর তাঁরা এসে থামলেন ঢালু ছাদের, বেশ প্রশস্ত একটি বাংলোর সামনে। এডওয়ার্ড নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন মরিস সাহেবের জন্যে। হাততালি দিয়ে বললেন, 'শ্যাতো ফিনলেতে সুস্বাগতম,' সামনের দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে দাঁড়ানো বারবার ছেলেটির মত কান্তিমান তরুণ জীবনে দেখেননি মি. মরিস। 'ও আহমেদ,' বললেন এডওয়ার্ড। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল তরুণ। 'আহমেদ তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে। গোসল করতে চাইলে বাড়তি কাপড়ের ব্যবস্থাও করবে।'

'তাহলে তো ভালই হয়।'

'আমরা সাধারণত রাত আটটায় খেতে বসি। আহমেদ তোমাকে ডাইনিং রূমে নিয়ে আসবে।'

তাহলে তাঁর ধারণাই ঠিক। এডওয়ার্ড বিয়েও করেছে। স্রেফ রক্ষিতা নিয়ে থাকা এডওয়ার্ডকে অন্তত মানায় না।

আহমেদ মরিস সাহেবকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিল। তারপর গোসলের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আহমেদের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গির মধ্যে কেমন যেন একটি মাদকতা আছে, প্রলুব্ধ এবং উত্তেজিত করার প্রচেষ্টা আছে। মরিস সাহেব ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠতে শুরু করলেন। স্থানীয় এই ছেলেগুলো তার কাছে সুন্দরী মেয়েদের চেয়ে কোন অংশে কম আকর্ষণীয় নয়। তারপরও, গোসল করতে করতে নিজেকে চোখ রাঙালেন মরিস, তাঁকে সাবধান থাকতে হবে। এডওয়ার্ডের আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি নেই—কিন্তু তিনি যা ভাবছেন সে কাজ করা মরক্কোতে রীতিমত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাছাড়া এটা যে একটা ফাঁদ নয় তারই বা নিশ্চয়তা কি? এডওয়ার্ড কি সত্যি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছে? তিনি এডওয়ার্ডের জায়গায় হলে কি ক্ষমা করতে পারতেন? এডওয়ার্ড প্ল্যান করে আহমেদকে তাঁর কাছে পাঠায়নি তো?

সুদর্শন আহমেদ গোসলের পর মি. মরিসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল এডওয়ার্ডের ঘরে। বারান্দাঅলা বসার ঘরটি নিচু চেয়ার আর টেবিল দ্বারা সুসজ্জিত। দেয়ালে মরক্কোর বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি ঝুলছে। এগুলো মরিস সাহেব সম্প্রতি তানজিয়ারে দেখেছেন।

এডওয়ার্ড একটি গ্লাসে মার্টিনি মিশাচ্ছিলেন। মরিসকে দেখে বললেন, 'আহমেদ কাজে কোন গাফিলতি করেনি তো?'

'আরে না! খুব কাজের ছেলে আহমেদ।'

'মার্টিনি চলবে নাকি স্কচ নেবে?'

'না, মার্টিনি চলবে না। ধন্যবাদ।'

'আমার স্ত্রী আমিনা এখুনি এসে যাবে। একসাথে খাব আমরা।'

'তুমি বিয়ে করেছ জানতাম না।'

'বোরখার আড়াল থেকে ওকে বাইরে নিয়ে আসতে আমাকে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি। এখন অবশ্য সে বাইরের অতিথিদের সাথে মানিয়ে নিতে পারছে।'

'তুমি এখানে সেট্‌ল্ হলে কি মনে করে?'

'খুব স্বাভাবিক। ইংল্যান্ডের ঝামেলা থেকে শেষ তক রেহাই পেয়ে আমি তানজিয়ার চলে আসি। তারপর এক উইক এন্ডে তেতুয়ানে আমিনার সাথে আমার পরিচয়।'

'স্রেফ চাষ-বাস করেই খামার বাড়ি কিনে ফেললে?'

'তা সম্ভব নাকি? এক খালা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর সব সম্পত্তি আমিই পাই।'

'ভাগ্যবান তুমি। ইংল্যান্ডে আর যাওনি?'

'খুব কম। কেন—তা তো জানোই।'

'এডওয়ার্ড,' কথাটা আবার বললেন মরিস, 'আমি সত্যি দুঃখিত।'

'মরিস, আমারও যদি কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখো এখন,' মার্টিনির গ্লাসটা শূন্যে তুললেন এডওয়ার্ড, 'এসো অতীতে কি হয়েছে তা ভুলে গিয়ে বর্তমানের এই পুনর্মিলনীকে স্মরণ করে মদ্যপান করি।'

দু'জনে 'উইশ' করে মদ ঢাললেন গলায়। একটু পরে আমিনা ঢুকল ঘরে। লম্বা, চওড়া হাড়ের অন্য বারবার সম্প্রদায়ের নারীদের মতই সে দেখতে। গায়ের রঙ যেন সোনালী ধুলো; গভীর, কালো, শান্ত একজোড়া চোখ, বিনুনি করা চুল। বিনয়ী ভঙ্গিতে মরিসকে সে সালাম দিল, আহমেদের মতই তার আচরণ বিনম্র এবং সংযত। অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে হলো মেয়েটিকে। আকর্ষণীয়া এবং উত্তেজক তো বটেই। ভাল ইংরেজি জানা সত্ত্বেও খাবার পরিবেশনের সময় সে স্থানীয় ভাষায় হুকুম দিয়ে গেল আহমেদকে। ভোজটা হলো দারুণ। সবশেষে কড়া মরাক্কান মদ। গিললেনও বটে মরিস সাহেব। একেবারে গলা পর্যন্ত। তাঁর বেসামাল অবস্থা দেখে আমিনা নিঃশব্দে একসময় উঠে গেল খাবার টেবিল ছেড়ে। অর্থহীন সব কথা বলতে লাগলেন মরিস সাহেব। বেশির ভাগই ফেলে আসা ইংল্যান্ডকে নিয়ে স্মৃতিচারণ। এক পর্যায়ে এডওয়ার্ড বললেন, 'তুমি দেখি অতীতের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না। তোমার তো এখন টাকার অভাব নেই। আমার টাকা নেই বটে তবে আমিনার

মত বউ পেয়ে আমি সত্যি সুখী।'

প্রায় পাঁড় মাতাল মরিস বললেন, 'তোমার সৌভাগ্যের শেষ নেই। তুমি ইচ্ছে করলেই যখন তখন ইংল্যান্ডে যেতে পারো।'

'কেন, তোমারও কি খুব যেতে ইচ্ছে করে নাকি?'

'হ্যাঁ, না। আ···আমি ঠিক জানি না। আমার অনেক টাকা আছে। আমি এখন সফল একজন মানুষ। কিন্তু আমার মত অনেকেই এখান থেকে আর নড়তে চায় না। তারা শুধু ব্রিজ খেলে আর সুযোগ পেলেই ছোকরাদের নিয়ে শুয়ে পড়ে। তবে আমি কিন্তু তাস-টাস খেলি না।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর এডওয়ার্ড জানতে চাইলেন, 'আরেক গ্লাস ব্র্যান্ডি নেবে নাকি ঘুমাতে যাবে? সারাদিনের কাজ শেষে নিশ্চই তুমি ক্লান্ত?'

'এখন ঘুমাব আমি,' স্বর ভারি শোনাল মি. মরিসের।

'আহমেদ ওর ঘরে চলে গেছে। তুমি নিজের ঘর চিনে যেতে পারবে?'

'পারব।'

এডওয়ার্ডের ধার দেয়া পাজামা পরে মরিস সাহেব নরম বিছানার এক কোণে খানিকক্ষণ বসে থাকলেন। সারা দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে চেষ্টা করলেন। কি অদ্ভুত যোগাযোগ! এতদিন পর এডওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁর দেখা—তাও পরিত্রাতা হিসেবে। আর কি অবাক কাণ্ড—ওকে দেখে মনে হয়েছে মি. মরিসের প্রতি তার কোন প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ স্পৃহা নেই। সত্যি এডওয়ার্ড আগের মতই রয়ে গেছে। নরম মনের মানুষ। আর আমিনা এবং আহমেদের কথা চিন্তা করো! এই দেখো, ভাবতেই গা কেমন গরম হয়ে উঠছে। নাহ্, মদটা বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, স্বীকার করতেই হবে। মাথার ঝিমঝিমানিটা যেন চেপে বসছে আরও। বিছানায় চিৎ হলেন মি. মরিস। প্রায় সাথে সাথে তার নাক ডাকা শুরু হলো।

কে যেন বিছানায় ওঠার চেষ্টা করছে, ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে জেগে গেলেন মি. মরিস। জড়ানো গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কে?' জবাব এল 'হুশ!' নরম একটা শরীরের স্পর্শ পেলেন তিনি চাদরের তলায়। তাঁকে জড়িয়ে ধরল। ঘুমের রেশ সম্পূর্ণ কাটেনি মরিসের। মনে হলো স্বপ্নের মধ্যে যেন ব্যাপারটা ঘটছে। হতে পারে আমিনা অথবা আহমেদ। অত তলিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করলেন না মি. মরিস। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে শরীরটাকে নিয়ে তিনি নিষিদ্ধ খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর যখন ওটা কাজ শেষ করে বিছানা থেকে নেমে গেল, বিড়বিড় করে আবার জানতে চাইলেন মরিস, 'কে তুমি?' 'হুশ' একই প্রত্যুত্তর পেলেন তিনি। জানালা দিয়ে গলে গেল সে।

সূর্যের তীব্র এবং প্রখর আলোর ছোঁয়া মুখে নিয়ে চোখ মেললেন মি. মরিস পরদিন সকালে। ঘর ঝাঁট দিচ্ছে আহমেদ। এক মুহূর্তের জন্যে মি. মরিসের মনেই পড়ল না তিনি কোথায় আছেন। হ্যাং ওভারের ধাক্কায় এখনও বেদিশা তিনি। তারপর সব কথা মনে পড়তেই ঝট করে ঘুরলেন আহমেদের দিকে। 'এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করলেন মরিস।

অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল আহমেদ। বলল, 'আমার মনিব বললেন

আপনি এখনও ঘুমাচ্ছেন কিনা দেখতে।'

না, কাল রাতে আহমেদ তাঁর কাছে আসেনি। ওটা ছেলেদের শরীর হলে ঠিকই বুঝতে পারতেন তিনি। 'ক'টা বাজে?'

'প্রায় এগারোটা, স্যার। মনিব জানতে চেয়েছেন আপনি এই ঘরে নাস্তা করবেন কিনা।'

বিছানায় উঠে বসলেন মি. মরিস, তাকালেন খোলা জানালা দিয়ে বারান্দার দিকে। 'হ্যাঁ, এখানেই নাস্তা নিয়ে এসো,' বললেন তিনি।

তাজা কমলা লেবুর রস, মচমচে টোস্ট আর গরম কফি দিয়ে নাস্তা সারার পরে মাথার ঝিমুনি ভাবটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। গত রাতের ঘটনাটা তাঁর কাছে স্রেফ একটা স্বপ্ন মনে হলো। বুড়ো বয়সে এরকম স্বপ্ন কম বেশি সবাই দেখে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তাঁর ঘর থেকে সেই গেস্ট হাউসের মত বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানে কে থাকে? বহিরাগত কেউ? কিন্তু এডওয়ার্ড যে বলল সে একাই তার খামারের দেখাশোনা করে। আহমেদ? গোসলের পানি রেডি, বলতে এলে তিনি আহমেদকে প্রশ্নটা করলেন। 'আমি? না, স্যার। আমি এই বাংলোতেই থাকি।'

'তাহলে কে থাকে ওখানে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আহমেদ, তবে চেহারায় ফুটে ওঠা অস্বস্তিকর ভাবটা লুকাতে পারল না। 'আমার মনিবের একান্ত ব্যক্তিগত ঘর ওটা,' বলে আর দাঁড়াল না সে।

মরিস ধীরে-সুস্থে গোসল সারলেন, কাপড় পরে চলে এলেন বসার ঘরে। এডওয়ার্ড অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্যে। 'ভাল ঘুম হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

'হ্যাংওভার কেটেছে?'

'একদম। চমৎকার মদের জন্যে আবার ধন্যবাদ।'

'এখন আরেক গ্লাস চলবে নাকি? স্থানীয় রেড ওয়াইন। খুব কড়া। ব্র্যান্ডি আর গিলো না। কাল রাতে তো দুই ফ্লাস্ক মেরে দিয়েছ।'

জোর করে যেন হাসলেন মরিস। 'পুরানো দিনের মত লেকচার-দেয়ার অভ্যাস তোমার গেল না দেখছি।'

'তাই নাকি? যাকগে শোনো, মেকানিক জোগাড় হয়েছে। তোমার গাড়িটার মায়া আপাতত ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য আরেকটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি তানজিয়ারে যাবার জন্যে।'

'সত্যি তোমার ঋণ শোধ হবার নয়।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ হয়ে থাকলেন। হঠাৎ মরিস চলে যাবার তাড়া দেখালেন। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছে ফাঁদে পড়েছেন তিনি, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু হুট করে উঠে যাওয়া ভাল দেখায় না। এ যেন কথা বলার জন্যেই প্রশ্ন করা : 'আচ্ছা, গেটের পাশে ওই গেস্ট-হাউসটাতে কে থাকে? আমি বারান্দা দিয়ে ওটার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম।'

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এডওয়ার্ড, মরিসের সামনে এলেন। 'তুমি ব্যাপারটা জানতে চেয়েছ বলে আমি খুশি হয়েছি। তুমি আমার পুরানো বন্ধু। কাজেই তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না।' একটু বিরতি। 'আমাদের একটা

মেয়ে আছে। সরাসরিই বলি, মেয়েটা একটা যৌন-উন্মাদিনী। ওই বাড়িতে সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে থাকে।'

এডওয়ার্ডের এই অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে বমি ভাব হলো মরিস সাহেবের। এর চেয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেও ভাল ছিল।

'কাল রাতে আমরা ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,' বললেন এডওয়ার্ড। 'ডেইজির সঙ্গী ফোন করে বলল ডেইজি নাকি পালিয়েছে। এর আগেও সে একবার এই কাজ করেছে। মেয়েটার মাথারও ঠিক নেই। আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছি, এমন সময় জানলাম—না, পালায়নি ডেইজি। কিছুক্ষণের জন্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে আবার।'

কাঠ হয়ে বসে থাকলেন মরিস সাহেব, বুকের ধুকধুকানি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। তার মানে কাল রাতে ঘটনাটা সত্যি ঘটেছিল। এডওয়ার্ডের জন্যে তাঁর মায়া হলো। 'মেয়েটার জন্যে তাহলে তো তোমার জীবন নরক হয়ে উঠেছে, ভাই,' বললেন তিনি সহানুভূতির সুরে।

করুণ হাসি ফুটল এডওয়ার্ডের মুখে। 'আসল খবরটা তো তুমি এখনও জানো না, মরিস। আমার মেয়ের ভয়ঙ্কর এইডস আছে।'

৫

অ্যাক্সিডেন্ট

খানিক আগে এক পশলা ঝুম বৃষ্টি হয়েছে। আকস্মিক বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। নিয়ন বাতির আলো পড়ে চিকচিক করছে অ্যাসফল্টের কালো রাস্তা। আমি বাঁ দিকে মোড় নিলাম, ঢুকে পড়লাম লন্ডনের সবচেয়ে অভিজাত ক্লাব 'কার্ডিনাল'-এ। মেইন এন্ট্রান্সে, পেভমেন্টের কাছে গাড়ি দাঁড় করাতেই ছুটে এল এক বেয়ারা। দরজা খুলে স্যালুট ঠুকল। আমাকে চেনে। কার্ডিনাল ক্লাবের নতুন সদস্য হলেও উদার হাতে বকশিশ বিলিয়ে ইতিমধ্যে অনেকের নজরে পড়ে গেছি। গেটম্যানের সশ্রদ্ধ অভিবাদনের জবাবে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়ালাম ভেতরের দিকে। কোথায় বসি জানা ছিল ক্লাবের রিসেপশনিস্টের। মিষ্টি হাসি উপহার দিল মেয়েটা, 'আপনার টেবিল খালি আছে, স্যার।'

হলরুমের এক কোণায় ছোট একটা গোল টেবিল, মুখোমুখি দু'খানা গদি মোড়া চেয়ার, আমি একটা দখল করলাম। তারপর পকেট থেকে বের করলাম সকালে পাওয়া টেলিগ্রামটা। কাগজের লেখাটার ওপর এ নিয়ে অন্তত দশবার চোখ বোলালাম: 'রাত আটটায় আসব আমি। কার্ডিনাল ক্লাবে। গরম্যান।'

গরম্যান মানে স্যার মাইলস গরম্যান, ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাট, সম্প্রতি মোমবালাসা থেকে দেশে ফিরেছেন—আফ্রিকায় ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় কলোনি ওটা। স্যার গরম্যান মোমবালাসার ব্রিটিশ হাই কমিশনার প্রয়াত জেনারেল র‍্যানডলফ লোসির পুরানো বন্ধু এবং দীর্ঘদিনের সহকর্মী।

লোসি মাস দুই আগে মারা গেছেন। ডিউটিতে থাকার সময় তাঁর মৃত্যু হয়, এই মর্মে খবর ছেপেছিল ব্রিটিশ প্রেস। তবে আমার পত্রিকা 'মেট্রোপলিটান ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' ওটা একেবারেই মিস করে ফেলেছে, এমনকি সেন্ট জনের গোরস্থানে লাশ দাফনের সংবাদ পর্যন্ত ছাপতে দেয়া হয়নি।

গোটা ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হলেও দুটো ঘটনা আমার কাছে বেশ অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এক—মৃত্যুর সঠিক কারণ ইংল্যান্ডের কেউই উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। দুই—লন্ডনে লাশটা পৌঁছেছে তালাবদ্ধ, সীল করা কফিনে। কঠোর নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই ডালা খোলা যাবে না। কেপ টাউন হাসপাতালের ডাক্তাররা ছাড়া আর কেউ জানেন না জেনারেলের মৃত্যুর আসল রহস্য। কারণ তারাই লোসির চিকিৎসা করেছেন।

তবে জেনারেলের মৃত্যু নিয়ে খুব বেশি হৈচৈ হয়নি। সুদূর আফ্রিকা থেকে একটা লাশ সীল করা কফিনে পাঠানো যেতেই পারে পচনের হাত থেকে রক্ষার জন্যে। তাছাড়া লোসি কিছুদিন আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন। ধারণা করা হয়, ওই আঘাতজনিত কারণে মৃত্যু হতে পারে। আর কফিন না খোলার যে নির্দেশ, তার ব্যাখ্যা একটাই—আফ্রিকার তীব্র গরমে লাশ যাতে পচে না যায় সে জন্যে শরীরে সুগন্ধি মাখানো হয়েছিল। আর কফিন খুললে ভেতরে বাতাস ঢুকে লাশ

বিকৃত হয়ে উঠতে পারে। সে কারণেই এত সতর্কতা অবলম্বন।

তো ওই ব্যাখ্যার পরে প্রেসের লোকজন স্বাভাবিক ভাবেই লোসির মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সময়ের সাথে সাথে ঘটনাটা অনেকে ভুলেও যায়।

কিন্তু আমি ভুলিনি।

এটাকে 'ইনটুইশন' বলুন আর গল্পের সন্ধানে সাংবাদিকদের সব ব্যাপারে নাক গলানোর বদভ্যাসই বলুন, আমি অন্যদের মতের সাথে নিজেকে মেলাতে পারছিলাম না। মৃত্যুর অন্তত আট মাস আগে জেনারেল কার অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন। তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তাঁর কাজে যোগদানের কথাও আমি শুনেছি। যদিও অস্পষ্ট একটা গুজব কানে এসেছে, ওই অসুস্থতার আট মাসের মধ্যে কিছুদিন মানসিক হাসপাতালেও তাঁকে কাটাতে হয়েছে। তবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়েই।

দুইয়ে দুইয়ে চার হচ্ছিল না কিছুতেই, বার বার খুঁতখুঁতে মন বলছিল কোথাও মস্ত একটা ঘাপলা আছে, অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোর মাঝে যোগসূত্রও একটা বোধহয় রয়েছে। সন্দেহটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে যেয়ে: ফরেন অফিসের লোকজনের সাথে কথা বলার অভিলাষ প্রকাশ করতেই তারা লাপাত্তা হতে লাগলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালের ডাক্তাররা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী নন বলে জানালেন, এমনকি জেনারেলের পরিবারের লোকজনও এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানাল।

হতাশ হয়ে পড়লেও আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, আমি নির্ঘাত অসাধারণ কোন সত্য আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি। যদিও তারপরও কেউ মন খুলে কথা বলতে চাইল না। শেষমেষ যখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না বলে ঠিক করেছি, ঠিক সেই সময় স্যার মাইলস গরম্যান এসে হাজির হলেন লন্ডনে।

ষাট বসন্তের অধিকাংশ সময় গরম্যান ব্যয় করেছেন কূটনীতির কাজে, গত তেইশ বছর ধরে তিনি মোমবালাসার ব্রিটিশ অ্যামব্যাসীতে আছেন। চাকরির সুবাদে লোসির সাথে তাঁর পরিচয়, সময়ের ধারাবাহিকতায় দু'জন দু'জনের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। আমার বারবার মনে হতে লাগল জেনারেলের মৃত্যুর ব্যাপারে আমার সকল প্রশ্নের জবাব আছে গরম্যানের কাছে। তাই এবার স্যার গরম্যানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালালাম।

প্রথমে মনে হলো বরাবরের মত বুঝি এবারও ব্যর্থ হতে চলেছি। কারণ স্যার গরম্যানের সেক্রেটারি গভীর জলের মাছ। যতবার স্যার গরম্যানের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চেয়েছি, সেক্রেটারি জানিয়েছে, 'তিনি শহরের বাইরে আছেন।' কিংবা, 'এখন মীটিং-এ ব্যস্ত, কথা বলা যাবে না।' অথবা, 'তিনি অসুস্থ।' যতই দিন যেতে লাগল ততই আমার ভেতরে সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠল যে, লোসির মৃত্যুর পেছনে অস্বাভাবিক কোন কারণ অবশ্যই দায়ী। যদিও এ ব্যাপারে সাহায্য করার মত লোক খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি।

স্যার গরম্যানের সাথে দেখা করার জন্যে যখন মরিয়া হয়ে উঠেছি, এইসময় একদিন সকালে একটা টেলিগ্রাম এল আমার অফিসে। স্যার মাইলস গরম্যান

পাঠিয়েছেন। ওটাই এখন হাতে নিয়ে বসে আছি আমি কার্ডিনাল ক্লাবের মেইন রুমে।

গভীর চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল ওয়েটারের আগমনে। দুটো বড় হুইস্কি আর সোডা নিয়ে এসেছে সে। পাশে লম্বা, বয়সী একজন মানুষ। ভদ্রলোকের মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে, ঘন ঝোপের মত ভুরু। সাথে ঠোঁটের ওপর মানানসই মস্ত গোঁফ। পরনে কালো ডিনার সুট, সাদা শার্ট এবং বো টাই, পায়ে দামী কালো লেদারের জুতো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। দেখেই বুঝতে পেরেছি ইনিই আমার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিথি, স্যার মাইলস গরম্যান। তিনি সজোরে আমার বাড়িয়ে ধরা হাতে ঝাঁকুনি দিলেন। ঝুঁকে বসে পড়লেন আমার বিপরীত দিকের চেয়ারে। মনে হলো যেন আমাকে দেখে স্বস্তি পেয়েছেন।

'ওয়েল, ইয়ংম্যান,' শুরু করলেন তিনি। 'তোমার সময় জ্ঞান দেখছি বেশ ভাল। আটটার সময় হাজির হতে বলেছিলাম। ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। এখন বলো তো আমাকে খুঁজছিলে কেন?'

'জেনারেল র‍্যানডলফ লোসির ব্যাপারে,' সরাসরি তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বললাম আমি। 'তাঁর অসুস্থতা এবং মৃত্যুর কারণ আমার কাছে যথেষ্ট রহস্যময় মনে হয়েছে। আপনি ছিলেন তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে আসল ঘটনাটা বলতে পারবেন।'

শরীর যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল স্যার মরগানের আমার কথা শুনে। কোণঠাসা একটা ভাব ফুটে উঠল চোখে।

'জানতে পারি কি,' আত্মরক্ষার সুরে বললেন তিনি, 'জেনারেলের অকাল মৃত্যু কেন তোমার কাছে অস্বাভাবিক এবং রহস্যময় ঠেকছে? কেপ টাউন থেকে তোমরা সাংবাদিকরা তো সব রিপোর্টই পেয়েছ।'

'রিপোর্ট—হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু ডিটেলস নয়। আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, স্যার মাইলস, কোন খবরের কাগজই মৃত্যুর আসল কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি।'

'ব্রেন ড্যামেজ,' চট করে বললেন স্যার মাইলস। 'ব্রেনের লোয়ার সেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; আর জানো নিশ্চই, উনি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন—সেই আঘাতজনিত কারণে মারা গেছেন।'

'আট মাস পরে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'আট মাস পরে তিনি তো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। শুনুন, স্যার মাইলস, আমি জানি অ্যাক্সিডেন্টের পরে তিনি ট্রাইবাল কাউন্সিলে বক্তৃতা দিয়েছেন, তারপর গ্রাম সফরে বেরিয়েছিলেন।'

কোন জবাব দিলেন না স্যার মাইলস, শুধু হাত দিয়ে চেপে ধরলেন ভুরু।

'তাছাড়া,' বলে চললাম আমি, 'আমার কাছে এ খবরও এসেছে যে একটি হাসপাতালে জেনারেলের চিকিৎসা করা হয় এবং মৃত্যুর আগে তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন সুস্থ শরীর নিয়েই। এখন স্যার, আপনি আমাকে বলুন, এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করার পর কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি ভাববে লোসির মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক?'

খালি গ্লাসটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন গরম্যান, গভীর চিন্তায় ডুবে

গেছেন। শেষে যখন কথা বললেন আবেগে কেঁপে গেল গলা। 'তুমি ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'তোমার সন্দেহ জাগাটা স্বাভাবিক। আমি তোমাকে যতই ফাঁকি দিতে চাই না কেন, তোমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হবে। যাহোক, আমি ঠিক করেছি সত্যি কথাই বলব! কারও না কারও সত্যি কথাটা জানা উচিত।' তাঁর স্বর আরও গভীর শোনাল। 'ইয়ংম্যান, যে গল্প আমি তোমাকে শোনাব তা এত অদ্ভুত, এত ভয়ঙ্কর এবং এমন অবিশ্বাস্য যে মানুষের উপলব্ধির বাইরে।'

টের পেলাম হার্টবিট বেড়ে গেছে আমার। গ্লাসটা আবার ভরে নিয়ে সিগার ধরালেন স্যার মাইলস গরম্যান। শুরু করলেন গল্প। 'ঘটনার শুরু প্রায় এগারো মাস আগে, শনিবারের এক সন্ধ্যায়। সেদিন আমি আর লোসি অ্যামব্যাসীর জুনিয়র অফিসারদের নিয়ে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় এসে বসলাম দু'জনে, হাতে ধূমায়িত কফির কাপ। এটা সেটা নিয়ে আলাপ করতে করতে অনেক সময় কেটে গেল।

'এ ধরনের পার্টিতে যা হয়, পর্যাপ্ত আহার আর মদের সাগরে ডুব দিয়ে গাল-গপ্পো ঝাড়তে ঝাড়তে সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সবাই। পার্টি শেষ হতে ভোর হয়ে এল। বাড়ি ফেরার তাগাদা অনুভব করলাম অবশেষে।

'লোসি মদ খেয়ে বেসামাল, গাড়ি চালানো দূরে থাক, গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত হেঁটেই যেতে পারছিল না ঠিকমত। করুণ অবস্থা দেখে ওকে আমার গাড়িতে লিফট দেয়ার কথা বললাম। কিন্তু গোঁ ধরে থাকল জেনারেল। না, সে নিজেই গাড়ি চালাতে পারবে। সামান্য তর্কাতর্কির পরে ঠিক হলো, লোসি তার নিজের গাড়িই চালাবে তবে ওর পেছনে থাকব আমি। যাতে পেছন থেকে কোন বিপদ এলে আগেভাগে সতর্ক করে দিতে পারি।'

একটু বিরতি দিলেন স্যার মাইলস। আবার শুরু করার আগে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলেন।

'বিশ মাইলের মত নিরুদ্বেগেই গাড়ি চালালাম আমরা, প্রাণ বা প্রাণীর চিহ্নও দেখলাম না কোথাও। হঠাৎ কেন জানি না, কারণটা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়, লোসির গাড়ি প্রবল বেগে একটা ঝাঁকি খেল, পিছলে নেমে গেল রাস্তা থেকে, ধাঁই করে বনেটটা ধাক্কা খেল একটা গাছের সাথে। মনে হয় ছুটন্ত কোন প্রাণী লোসির গাড়ির সামনে পড়ে গিয়েছিল, ওটাকে বাঁচাতে গিয়ে সে ব্রেক ফেল করে। আবার অতিরিক্ত মদ পানের কারণেও ব্যাপারটা ঘটতে পারে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে সত্যি হয়েছিল,' বললাম আমি। 'যা শোনা গিয়েছিল তার খানিকটা যে সত্যি, প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন গরম্যান। 'লোসি অ্যাক্সিডেন্ট করে। ওই সময়ে ভেবেছিলাম অবস্থা মারাত্মক। কাছে গিয়ে দেখি ধাক্কার চোটে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে পড়েছে মাটিতে, অজ্ঞান, কপালে আঘাতের দাগ স্পষ্ট। যাহোক, ওকে বয়ে নিয়ে এলাম আমার গাড়িতে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কাছের হাসপাতাল একশো মাইল দূরে। অতদূর নিয়ে যাওয়াটা ঝুঁকি মনে হলো। কাছের একটা গ্রামে ছোট একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঠিকানা জানা ছিল আমার। গ্রামে যেমন হয় আর কি—দু'তিনটে বেড, একজন ডাক্তার চিকিৎসা করেন স্থানীয়দের।

'ডাক্তার পরীক্ষা করলেন লোসিকে। হাড়-টাড় ভাঙেনি, তবে জ্ঞান ফেরেনি তখনও, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওকে ওই হাসপাতালে রাখার ব্যাপারে দু'জনেই একমত হলাম। আমার আর ওখানে থাকার প্রয়োজন নেই জেনে সোজা বাড়ি ফিরলাম।

'পরদিনই অফিসের কাজে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে হলো। কাজেই লোসির খবরাখবর কিছুই জানতে পারিনি। অবশ্য পরের শুক্রবারই ফিরে এলাম। অবাক কাণ্ড! লোসিকে দেখি বসে আছে তার চেয়ারে, কপালের একটা পাশ ফোলা ছাড়া অসুস্থতার চিহ্নমাত্র নেই গোটা অবয়বে।'

'খুব দ্রুত সেরে উঠেছিলেন দেখছি,' বিড়বিড় করলাম আমি।

স্যার মাইলস আবারও সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'দৃশ্যত তাই। দিন দুই অজ্ঞান ছিল ও। আঘাত-টাঘাতও তেমন লাগেনি কোথাও, মাথা ছাড়া। ডাক্তার ওকে সুস্থ হতে দেখে কাজের অনুমতিও দিয়েছেন। হপ্তাখানেকের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টের একমাত্র চিহ্ন কপালের ফোলা দাগটাও মিলিয়ে গেল। মানুষ ভুলেও গেল ব্যাপারটা।'

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়ার জন্যে থামলেন স্যার গরম্যান, তারপর শুরু করলেন আবার। 'অ্যাক্সিডেন্টের প্রায় হপ্তা তিনেক পর লোসি হঠাৎ বলতে শুরু করল তার ভয়ানক মাথা ব্যথা করছে। বাঁ চোখের নিচ থেকে শুরু হয় ব্যথাটা।

'অতিরিক্ত কাজের চাপে মাথা ব্যথা করছে ভেবে ব্যাপারটাকে তেমন আমল দিল না লোসি। কিন্তু যত দিন গেল অবস্থা আরও খারাপ হতে শুরু করল, শেষ দিকে মাথার যন্ত্রণায় লোসি এমন চিৎকার দিতে লাগল যে অ্যামব্যাসীর সবাই তা শুনতে পেত। শুধু তাই নয়, প্রায়ই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল কাজ করতে গিয়ে। কাজেই ওর চিকিৎসা জরুরী হয়ে দাঁড়াল।

'কর্তৃপক্ষ লোসিকে বিশ্রাম নেয়ার নির্দেশ দিলেন ওর পক্ষে অফিস করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে। সেই সাথে প্রতিদিন ওর বাড়িতে ডাক্তারের যাতায়াত অব্যাহত রইল।'

'অ্যাক্সিডেন্টে ব্রেনের কোন ক্ষতি হতে পারে,' বললাম আমি। 'যেটা ওই সময়ে বোঝা যায়নি।'

'ডাক্তারের ধারণাও ছিল তাই,' জবাব দিলেন স্যার মাইলস। 'ওকে আমি প্রতিদিন দেখতে যেতাম। লক্ষ করতাম স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অবনতি হচ্ছে ওর। দ্রুত ওজন হারাচ্ছিল লোসি, ত্বকের রঙ হয়ে উঠছিল ধূসর, ম্লান। আর মাথার যন্ত্রণাটা এখন আরও ঘন ঘন হচ্ছে। শুধু ওষুধ খেলে খানিকক্ষণ একটু ভাল থাকে বেচারা। তারপর আবার শুরু হয়।'

'নিশ্চই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তিনি,' মৃদু গলায় বললাম আমি, যেন নিজেকেই কথাটা শোনালাম।

'ঠিক তাই,' মুখ করুণ করে জবাব দিলেন স্যার মাইলস। 'কিন্তু পরবর্তীতে যে কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছিল তার তুলনায় ওই সময়ের কষ্ট কিছুই ছিল না।'

'কি হয়েছিল পরে?'

'লোসির অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত

নেয়া হয় ওকে কেপ টাউনের হাসপাতালে পাঠানো হবে।'

'মানসিক হাসপাতালে?'

মাথা নাড়লেন স্যার মাইলস। 'না, তখন অমন অবস্থা ছিল না ওর। ব্রেন অপারেশন জরুরী হয়ে পড়েছিল অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা দেখতে। যাহোক, হাসপাতালে নেয়ার পর দিন কয়েক ওকে ডাক্তারদের অবজারভেশনে রাখা হলো, সেই সাথে বিভিন্ন টেস্ট চলল।

'টেস্টে ধরা পড়ল না কিছুই। কাজেই অনিবার্য হয়ে উঠল অপারেশন।

'সার্জনকে বলেকয়ে অপারেশন দেখার অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলাম আমি আগেই। লোসির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে অনুমতি পেতে সমস্যা হয়নি।

'অপারেশনের দিন অপারেটিং থিয়েটার সংলগ্ন একটা ঘরে আমাকে ঢোকানো হলো। দেখলাম লোসিকে শোয়ানো হয়েছে একটা টেবিলে।

'লোসিকে আমার অচেনা মনে হচ্ছিল—ওর উজ্জ্বল, স্বচ্ছ চোখ জোড়া ঢুকে গেছে খুলির ভেতরে, কাঠামোটা ভাঙাচোরা, চেনাই যায় না, হাড়ের সাথে লেগে আছে ধূসর চামড়া। আর ওর মাথাটা, অপারেশনের জন্যে পরিষ্কারভাবে কামানো, চকচক করছিল আলোতে।

'দক্ষ আঙুলের ছোঁয়ায় সার্জন ওর খুলির ওপর একটা হালকা রেখা খুঁজে নিলেন চোখের ঠিক পাঁচ ইঞ্চি ওপরে, গা হিম করা অনুভূতি নিয়ে দেখলাম একটা করাত তুলে নিলেন তিনি হাতে, কাঠ চেরার মত রেখাটার ওপর ওটা বসালেন, এক হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে, চাপ দিলেন করাতে, ধারাল দাঁতগুলো কেটে খুলির গভীরে ঢুকে যেতে লাগল।

'খুলি কাটার ওই শব্দ, কি বলব তোমাকে ইয়ংম্যান, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমি ভুলতে পারব না। তবে তারপর যা ঘটল তার জন্যে আমি মানসিক ভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

'প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সার্জন ফাঁক করা ব্রেন নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, পেলেন না কিছুই, সব ঠিকঠাক মনে হলো।

'কাজ শেষ করার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন সার্জন আমার দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল অমানুষিক এক চিৎকার। সবাই ঝট করে তাকাল চিৎকারের উৎসের দিকে, মুখ হাঁ করে আছে কমবয়েসী এক নার্স, কাঁপা হাত দিয়ে কি যেন দেখাতে চাইছে লোসির রক্তাক্ত মাথাকে নির্দেশ করে। "ওখানে কি যেন একটা," ফিসফিস করল সে, "নড়ছে ওটা! হাঁটছে"!

'বিদ্যুৎগতিতে লোসির দিকে শরীর বাঁকালেন সার্জন, পাগলের মত খুঁজতে শুরু করলেন নার্সের দেখা চলমান বস্তুটিকে। আমার পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল তিনি হাত সোজা করতেই। ফোরসেপের মধ্যে আটকানো জিনিসটাকে প্রথমে মনে হলো জমাট বাঁধা রক্ত খণ্ড, কিলবিল করছে। নাড়া দিলেন তিনি ওটাকে আস্তে, ছয়টা জ্যান্ত পা প্রথমে নজরে এল, রোমশ ছয়টা পা, যুক্ত হয়ে আছে ছোট, মোটা শরীরের সাথে—ওটা একটা মাকড়সা!'

আঁতকে উঠলাম আমি কথাটা শুনে। 'মাকড়সা?' গোঙানির মত শোনাল আমার কণ্ঠ। 'ওনার মাথায়?'

মাথা দোলালেন স্যার মাইলস। 'হ্যাঁ, মাকড়সা। সম্ভবত লোসি যখন গ্রামের ওই হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল, তখন মাকড়সাটা ওর কাছে আসে। আফ্রিকার ঠাণ্ডা রাত, উষ্ণতা খুঁজতে প্রাণীটা প্রথমে লোসির মুখ বেয়ে ওঠে, তারপর নাকের ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। অচেতন ছিল বলে লোসি কিছুই টের পায়নি। পরে, তার মাথায় যন্ত্রণাটা শুরু হয়, যেদিন থেকে মাকড়সাটা ধীরে ধীরে ওর মগজ খেতে শুরু করে।'

'তারপর তিনি মারা গেলেন?'

'না। আপদটাকে দূর করার পরে লোসি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। দুর্বল হলেও মাস কয়েকের মধ্যে সে কাজেও যোগ দেয়।'

'তারপর?'

'তারপর সবকিছুই ঠিকঠাক মনে হচ্ছিল। লোসি আবার দ্রুত তার ওজন ফিরে পায়, দিনগুলো হয়ে ওঠে আগের মতই মধুময়। তাকে অবশ্য আসল ঘটনা কিছুই জানানো হয়নি শক্ড্ হবে বলে। সব যখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে, এই সময় একদিন আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো লোসির। আবার গায়ের রঙ ধূসর বর্ণ ধারণ করল। এবার অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। অন্ধ হয়ে গেল লোসি। মেন্টাল ব্রেক ডাউনের শিকার হলো সে।'

চামড়ার ওপর দিয়ে কি যেন হেঁটে গেল আমার। শিরশির করে উঠল গা। 'গুড গড!' আস্তে করে জানতে চাইলাম আমি, 'আরেকটা মাকড়সা নয় তো?'

জবাব দেয়ার আগে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন স্যার মাইলস, যখন কথা বললেন কেঁপে গেল গলা। 'নো, ইয়ংম্যান। আরেকটা মাকড়সা নয়।'

'তাহলে কি?'

আমার প্রশ্নটাকে অগ্রাহ্য করলেন তিনি, গল্পটার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চললেন। 'যা বলছিলাম, লোসির মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়, মানসিক হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া উপায় থাকে না। শুরুতে আমি নিয়মিত ওকে দেখতে যেতাম। কিন্তু যত দিন গেল মনে হলো ওর আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল। অন্ধ চোখ দুটো ভাষাহীন, বিকৃত মস্তিষ্ক সুস্থ চিন্তা-ভাবনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাছাড়া, দিন দিন শুকিয়ে লোসি হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, ওর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

'যে সার্জন লোসির অপারেশন করেছিলেন তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি বললেন আবার একটা অপারেশন করলে লোসি এবারের মত রক্ষা পেতে পারে। তাঁর যুক্তি, মাকড়সাটা নিশ্চই ব্রেনের মারাত্মক কোন ক্ষতি করেছে, যেটা অপারেশনের সময় ধরা পড়েনি চোখে।

'অপারেশনের দিনক্ষণ ঠিক করা হলো। আমি আবার আমার বন্ধুর অপারেশন দেখার জন্যে হাজির হলাম। সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো। টেবিলে শোয়ানো লোসির মাথাটাকে দু'ভাগ করে ফেলা হলো করাত দিয়ে। তার পরপরই সার্জন চিৎকার দিলেন ভয়ে এবং ঘৃণায়।

'লোসির উন্মুক্ত ব্রেনের সামনের অংশে নড়ছে, হাঁটছে, ছোটাছুটি করছে ছোট ছোট পা আর শরীর নিয়ে অনেকগুলো মাকড়সা। খুদে মাকড়সাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে গোটা মাথা জুড়ে। দুটো জোড়াকে দেখা গেল দৌড়াতে, যেন ভূতুড়ে

নাচ নাচছে। কয়েকটার পিঠে আবার ডিমও আছে, আলোতে কুঁকড়ে গি জেনারেলের মাথার ফাটলের মধ্যে সেঁধুতে শুরু করল।

'রক্তমাখা কয়েকটি মাকড়সা হাত বেয়ে উঠে এসেছিল সার্জনের, ঝাড়া দিয়ে সেগুলো ফেলে দিলেন তিনি। সভয়ে সরে গেলেন অপারেশন টেবিল থেকে।'

'তার মানে,' শিউরে উঠলাম আমি। 'অতগুলো মাকড়সা সব জেনারেলের নাক দিয়ে মাথায় ঢুকেছে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন স্যার গরম্যান। 'না,' বললেন তিনি। 'আসল ঘটনা হলো যে মাকড়সাটা আগে তার মাথায় বাসা বেঁধেছিল ওটার তখন ডিম পাড়ার সময় হয়ে এসেছিল। কেউই বুঝতে পারেনি ওটা একটা মেয়ে মাকড়সা। লোসির ব্রেনে মাকড়সাটা বেশ কিছু ডিম পাড়ে। মস্তিষ্কের তাপে সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়, আশ্রয় খুঁজে নেয় ব্রেন সেলগুলোতে, মগজ খেয়ে ওগুলোও বেঁচে থাকে।'

'আর জেনারেল?'

'তার আর জ্ঞান ফেরেনি। তবে আসল ঘটনা ইচ্ছে করেই চেপে যাওয়া হয়েছে। কে বিশ্বাস করবে এসব কথা?'

পরদিন সকালে বাসে চেপে আমি ইসলিংটনে, সেন্ট জনের গোরস্থানে গিয়ে হাজির হলাম। জেনারেল র‍্যানডলফ লোসির কবর খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। কবরের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। ভাবলাম আমার পায়ের নিচে, মাটিতে যে মানুষটা শুয়ে আছেন তাঁকে মৃত্যুর আগে কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হয়েছে।

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠল। নির্জলা আতঙ্ক নিয়ে দেখলাম দুটো ছোট, পেটমোটা মাকড়সা কবরের পাশে ভেজা মাটি ফুঁড়ে বেরুল, তারপর কিলবিল করে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘাসের জঙ্গলে।

মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল। কবরের মাথার পাথর খণ্ডের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে গেলাম নিজেকে। কিন্তু পিছলে গেল পা। ঠাণ্ডা, ছাতা ধরা স্ল্যাবের সাথে ভীষণভাবে ঠুকে গেল মাথাটা। টের পেলাম দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে আমার পৃথিবী।

****

ভয়াল কাহিনী

অনীশ দাস অপু

আতঙ্কের প্রহর

বিচিত্র এবং ভিন্ন স্বাদের এক ডজনেরও বেশি গল্প আছে বইটিতে। 'আতঙ্কের প্রহর'-এ নির্জন কটেজে এক ম্যানিয়াকের কবলে তরুণী জেনের প্রাণ সংশয় আপনাকে আতঙ্কিত করে তুলবে। 'পরকীয়া'য় এক দম্পতির পরকীয়া প্রেমের অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে হবেন রোমাঞ্চিত; 'প্রতিহিংসা' গল্পে দু'জন মানুষের রোমহর্ষক প্রতিশোধের ধরন আপনাকে করবে চমকিত। এছাড়াও, অন্যান্য গল্পগুলো পড়ার সময় ভয়, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা আচ্ছন্ন করে রাখবে আপনাকে।



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০